মোহিনী

অদ্রীশ বর্ধন

প্রথম পর্ব

মনের ডাক্তারি করে বেশ দু-পয়সা করেছি আমি। কিন্তু যে কাহিনী আপনাদের বলতে যাচ্ছি, তা ডাক্তারি কাহিনী নয়—গোয়েন্দা কাহিনী। আমিই এ কাহিনীর গোয়েন্দা।

জানুয়ারির শেষের দিকে পুরী গেছিলাম। একা। আমার তিন কুলে কেউ নেই। বিয়ে-থাও করি নি। বন্ধুবান্ধব সব বউ নিয়ে ব্যস্ত। তাছাড়া, বিয়ের পরেই পুরুষগুলো সব কিরকম হয়ে যায়। খুব তেজী মেয়েদেরও দেখেছি, মাথায় সিঁদুর দিতে না দিতেই পোষা কুকুরের মত ল্যাজ নাড়তে নাড়তে সোয়ামীর পেছন পেছন ঘোরে। আবার বোহেমিয়ান পুরুষগুলোও লক্ষ্মীসোনা হয়ে যায় যেন বিয়ের পরেই—বউয়ের আঁচল ছাড়া আর কিছু বোঝে না।

ভাবছেন বিয়ে-থা না করার ফলে মনের জ্বালায় এই ধরনের কথাবার্তা ছাড়ছি। নিজেই একজন মনের রুগী হয়ে গেছি। কিন্তু ভুলে যাবেন না, রোজ এত রকমের রুগী ঘাঁটবার সুযোগ হয় বলেই বিয়ের বকলস-পরানো স্ত্রী-পুরুষদের দেখবার দুর্ভাগ্য আমার সবচেয়ে বেশি।

যাক, গোড়াতেই পাঠক-পাঠিকাদের চটিয়ে দিলে আমার এই কাহিনী অপঠিত থেকে যেতে পারে। তবে খোঁচা খেয়ে যাঁরা চটেছেন, তাঁরা যদি শেষ পর্যন্ত পড়েন, আমাকে খোঁচা মারার সুযোগ পাবেন।

অলমিতি।

হ্যাঁ, পুরীতেই এই কাহিনীর শুরু। জানুয়ারির শেষ থেকে শুরু হয়ে ফেব্রুয়ারির গোড়ার মধ্যেই শেষ হয়ে গেছিল শ্বাসরোধী, ঘাত-

প্রতিঘাতময়, রহস্যাকীর্ণ, চক্রান্ত-চঞ্চল লোমহর্ষক সেই কাহিনীর প্রথম পর্ব।

ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ আমি, ক্রুর কুটিল জীবনের সঙ্গে পরিচয় কম—ভয়ঙ্কর জীবনাবর্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল সেই প্রথম। তার পর থেকেই জীবনের মোড় ফিরে গেল আমার। এক অধ্যায়ের সমাপ্তি টেনে শুরু করলাম আর এক অধ্যায়।

যেহেতু আমি হৈ-হট্টগোল পছন্দ করি না, নির্জনতাকে পছন্দ করি মনপ্রাণ দিয়ে, তাই পুরী গিয়ে কোন হোটেলে উঠি নি—এমনকি সবচাইতে খানদানী এবং বিচ্ছিন্ন হোটেলটিকেও সযত্নে পরিহার করেছি—উঠেছি স্বর্গদ্বারের ওপারে নির্জন সৈকতের একটি বহুতল বাংলোয়।

বাড়িটা রোমাঞ্চকর। সামনের দিকটার অর্ধেক বালিতে ঢেকে গেছে। জানলার গোবরাট পর্যন্ত বালি ঠেলে উঠেছে। চারদিক ঘেরা পাঁচিল টপকে বালি ঢুকে পড়েছে ভেতরকার উঠোনেও। এককালে ছোট্ট বাগান ছিল সেখানে—এখন তা বালিতে আবৃত। পেছনকার দরজাটা পর্যন্ত পুরোপুরি ঢেকে গেছে বালিতে। ফলে, বাড়িতে পাঁচিল থাকা আর না থাকা একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বর্গদ্বারের শ্মশানের পাশ দিয়ে সঙ্কীর্ণ যে রাস্তাটি অগুনতি হলিডে-হোমের মাঝখান দিয়ে এসে সমুদ্রের পাশ বরাবর দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত, যে রাস্তার দুপাশে এবং পুরীর শেষ প্রান্তে হিপিরা ভাঙাচোরা এক-একটি ঘর নিয়ে রহস্যজনক ক্রিয়াকলাপে নিমগ্ন, সেই রাস্তা থেকে যে-কেউ এসে বালির পাহাড় টপকে ঢুকে পড়তে পারে আমার নিভৃত নিকেতনে।

সেজন্যে আমার প্রাণে কোন শঙ্কা ছিল না। ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। স্বর্গদ্বারেই সারা গায়ে উল্কি আঁকা এক হিপিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার সারা গায়ে এসব কি এঁকেছো? এক হাতের কমণ্ডলু এবং আরেক হাতের ত্রিশূল শূন্যে তুলে নীলচক্ষু

শ্বেতকায়টি অট্টহাসে বলেছিল, নাথিং টু টেক ফ্রম মী। আমারও সেই একই কথা। কিছুই নেবার নেই যার কাছ থেকে, নিভৃত নিকেতনে একাকী থাকতে তার ভয় কিসের? বরং আছে শান্তি, অনাবিল শান্তি; শহর থেকে, লোকালয় থেকে, স্নানার্থীদের উদ্দামতা থেকে, সমুদ্র দর্শনার্থীদের লঘু চাপল্য থেকে দূরে অনেক দূরে সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে ক'টা দিন নিজের মনের মধ্যে ডুবে যাওয়ার মধ্যে যে অনির্বচনীয় প্রশান্তি—তা কি কাউকে বলে বোঝানো যায়? সেটা উপলব্ধির বিষয়। হিপিরা বোধ হয় এই শান্তির সন্ধানেই পুরীর প্রান্তদেশে এই অঞ্চলটিতে দরজা আর জানলা বিহীন জীর্ণ ইষ্টকালয়-গুলিতে দলে দলে বাসা নিয়েছে। এখানে বসেই তারা সোজা সামনে চেয়ে থাকে—রৌপ্যকিরীট সুশোভিত বিশাল তরঙ্গভঙ্গ দর্শন করে—আর বুঝি সোজা অস্ট্রেলিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়ার মাথার ওপর দিয়ে ধেয়ে আসা সমুদ্র-সমীরণকে সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে উপলব্ধি করে।

রান্নাবান্নার কোন ব্যবস্থাই রাখি নি আমার বালিতে পোঁতা নিরালা গৃহটিতে। হোটেল থেকে টিফিন কেরিয়ারে খাবার দিয়ে যেত। খুব ক্ষিদে পেলে নিজে গিয়ে খেয়ে আসতাম। বাকি সময়টা সমুদ্রের ধারে একা একা পায়চারি করতাম। কখনো বই পড়তাম। কখনো বালির ওপরে বসে জেলেদের মাছ ধরা দেখতাম। কখনো স্নানের পোশাক পরে কিছুক্ষণ নোনা জলে শরীর ভিজিয়ে বালির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতাম।

আমার এই নির্জন সমুদ্র অবগাহনের সাক্ষী ছিল মাত্র একজন। প্রায়-বৃদ্ধ এক শ্বেতকায় হাফ প্যান্ট পরে খালি গায়ে সকাল সন্ধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত সমুদ্রের ধারে। প্রথমে ভেবেছিলাম পাগল। কিন্তু কাছ থেকে তার ঘোলাটে চোখ আর ঠোঁটের কোণে সদাজাগ্রত মৃদু হাসির মধ্যে দেখেছিলাম প্রজ্ঞার লক্ষণ। মুখের মধ্যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ছাপ। কিন্তু বুঝি নি কেন মানুষটা দিনের পর দিন এভাবে

দাঁড়িয়ে থাকে সমুদ্রের ধারে। সোজা চেয়ে থাকে সামনে—যেন দূরবিস্তৃত চাহনি দিয়ে দেখতে পায় সুমাত্রা জাকার্তা পেরিয়ে অনেক দূরের অস্ট্রেলিয়াকে।

একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার নিবাস কোথায় জানতে পারি?

স্বপ্নালু চাহনি আমার দিকে ফিরিয়ে দীর্ঘকায় অর্ধনগ্ন মানুষটা মৃদু হাসি দিয়ে আমাকে আপ্যায়ণ করেছিল। বলেছিল, ওই ওখানে।

কোথায়?

অস্ট্রেলিয়ায়।

এখানে কতদিন আছেন?

অনেক দিন।

কতদিন থাকবেন?

জানি না।

কোথায় উঠেছেন?

মৃদু হাসি বিস্তৃত হল—জবাব এল না। নিবাস গোপনকারী ব্যক্তিটিকে আর প্রশ্ন করি নি আমি।

দিন তিনেক পরে অস্ট্রেলিয়ার সুনীল-চক্ষু মানুষটির এই-ভাবে স্বপ্নমদির চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যতিক্রম ঘটল। প্রতিটি অপরাহ্নে যে মানুষটা সূর্যাস্তের রাঙা আলো সর্বাঙ্গে মাখিয়ে নিয়ে সন্ধ্যার আগমনে অশরীরীর মতই মিলিয়ে যেত অন্ধকারে, তৃতীয় দিবসের অপরাহ্নে তাকে দেখতে পেলাম না বিশেষ সেই স্থানটিতে। তার পরিবর্তে দেখলাম একটি নতুন মানুষকে। একটি মেয়েকে।

শুভ্রতার ওপর মেয়েটির অপরিসীম প্রীতি লক্ষ্য করেই থমকে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। শুভ্র ব্লাউজ, শুভ্র শাড়ি শুভ্রতর হয়ে উঠেছে শ্যামল গাত্রবর্ণের পটভূমিকায়। একমাথা ঘন ঝোঁকড়া চুল টেনে বাঁধা শক্ত কবরীতে। টানা টানা ভুরুর নিচে কৃষ্ণকায় চক্ষু দুটি বড়

বেশি ম্লান এবং বিষাদ-স্নিগ্ধ বলে মনে হল। বয়স তিরিশের মধ্যে। সুন্দরী সে নয়, কিন্তু তার আত্মনিমগ্ন রূপটি আমাকে বড় বেশি আকর্ষণ করেছিল। বালির ওপর বসে দুই উত্তোলিত হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে নির্নিমেষে চেয়েছিল সগর্জন জলরাশির দিকে। হাওয়ায় উড়ছিল সাদা শাড়ির আঁচল। আর পাশের অসংখ্য বালুকা-বিবর থেকে লাল কাঁকড়াগুলি পর্যন্ত নির্ভয়ে বেরিয়ে এসে যেন অবাক হয়ে দেখছিল শিলামূর্তির মত নিথর দেহিনীকে।

কে এই অপরূপা ?

সূর্য অস্ত গেল। সন্ধ্যা নামল। দূরে দাঁড়িয়ে বিস্মিত চাহনি মেলে রইলাম তার পানে। এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিকে দু' চোখ দিয়ে লেহন করা যে অন্যায় এবং শালীনতা বহির্ভূত, তা জেনেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলাম না, সরে যেতে পারলাম না। আদিম সমুদ্রের সৈকতে মানুষ মাত্রেই কি আদিমতার আস্বাদ পায় এইভাবে ?

চতুর্থ দিন প্রত্যূষে গর্জমান সমুদ্রের ধারে এসে দেখলাম একই ভাবে হাঁটুতে থুতনি রেখে চুপ করে বসে রয়েছে মেয়েটি। সূর্যের তাপ অসহ্য না হওয়া পর্যন্ত বসে রইল। তারপর উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে চলে গেল পেছনের রাস্তাটির দিকে। বিশাল একটা বালুকা-গহ্বরের পাশ দিয়ে প্রবেশ করল একটি জীর্ণ ইষ্টকালয়ে।

অপরাহ্নেও তাকে দেখলাম একাকিনী। বুঝলাম, আমার মতই নিঃসঙ্গ সে। বিচিত্র নিঃসন্দেহে! পুরুষ মানুষও পুরীর প্রান্তে একাকী থাকতে ভয় পায়—বিশেষ করে হিপিরা যেখানে আস্তানা নিয়েছে। এ মেয়েটি একাকিনী কোন সাহসে সেখানে থাকে ?

কে এই রহস্যময়ী ?

পঞ্চম দিনও ভোরের আলোয় শ্যামলিনীকে দেখলাম নীরবে নিশ্চুপে বসে থাকতে সাগরপারে। কনফার্মড ব্যাচেলর বলতে যা বোঝায়, আমি কিন্তু তাই বলেই নিজেকে ভাবতাম। যৌবনের প্রথমে

আইবুড়োমন্দির নামক একটি ক্লাবের সেক্রেটারীও ছিলাম দীর্ঘকাল। দেউলটি দেউলে হয়ে গেছে সদস্যরা ধর্মত্যাগ করায়। এক আমি ছিলাম স্বধর্মনিষ্ঠ হয়ে। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের উপকূলে রজতশুভ্র বসন পরিহিতা লাবণ্যময়ীকে দেখে কেন এত উত্তেজিত এবং কৌতূহলী হলাম, তা বিধাতাই কেবল জানেন।

পঞ্চম দিনের উষার শুভলগ্নে তাই আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম জীবন্ত প্রহেলিকার পাশটিতে।

মুখ তুলে চাইল মেয়েটি। ক্ষণেক চেয়ে রইল মুখের দিকে। কি যেন অন্বেষণ করল আমার চোখের মধ্যে। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চাইল সমুদ্রের পানে।

আমি বললাম, গায়ে পড়ে আলাপ করতে এলাম।

মেয়েটি আবার মুখ তুলে চাইল। এবার সামান্য হাসল। বিষাদ-সিন্ধু যেন উথলে উঠল সেই হাসির মধ্যে।

বললাম, ক'দিন ধরেই দেখছি, আপনি একা আসেন। সঙ্গী কেউ নেই, আমিও একা আসি, তাই ভাবলাম আলাপ করে নিই। রাগ করছেন না তো?

মুখ টিপে সেই রকমই নিতল হেসে মেয়েটি বললে মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে, না, না, রাগ কবব কেন। বসুন আপনি।

স্বচ্ছন্দ আহ্বান। এত আশা করি নি। বসলাম রহস্যময়ীর পাশে। আত্মপরিচয় দিলাম। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঙ্কেতে দেখিয়ে দিলাম কোথায় আমার নিবাস।

মেয়েটি তখন পরিচয় দিলে নিজের। প্রথম আলাপেই এতখানি কথা সে বলবে, ভাবতেও পারি নি। মেয়েটির নাম মালিনী। মালিনী পোদ্দার। এক সুবর্ণবনিক ধনকুবেরকে বিয়ে করেছিল। বোম্বাইতে সোনার গয়নার বিজনেস ছিল ভদ্রলোকের। নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি মারা গেলে ব্যবসা বেচে দিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়

মালিনী। ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিটে রাখা টাকার সুদে এইভাবেই চলে যাবে জীবনের শেষ ক'টা দিন। নির্জনতা ভালবাসে বলেই উঠেছে পুরীর প্রান্তে ওই বাড়িটিতে। ভাড়াও কম। রেঁধে-বেড়ে নেয় নিজেই। মাসখানেক থাকবে।

অভিভূত হলাম মালিনীর চাপা বেদনার বহিঃপ্রকাশে। আবার বিকেলে দেখা হবে বললাম। বেলা হয়ে যাচ্ছিল বলে উঠে পড়লাম। স্বর্গদ্বারের হোটেলের দিকে আসবার সময় পেছন থেকে হনহন করে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমার নাগাল ধরে ফেললেন। পকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ড বার করে দেখালেন আমাকে। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসার।

বিস্মিত হলাম। পুলিশ আমার কাছে কেন?

ভদ্রলোকের বয়স মাঝারি। একমাথা কাঁচাপাকা চুল বেশ তেল-চুকচুকে। পানের রস ঠোঁটের কোণ দিয়ে গড়াচ্ছে। শুকনো খটখটে শ্যামকান্তি। পরনে জীনসের প্যান্ট আর নামাবলী প্রিন্ট বুশশার্ট। মূর্তিমান অপসংস্কৃতি।

বললেন, আমার নাম জগন্নাথ দাস। আপনার নামটা জানতে পারি?

বিপুল গুহ, ডাক্তার। সাইকিয়াট্রিস্ট। কলকাতায় প্র্যাকটিশ করি।

বই-প্যাটার্নের পানের ডিবে বেরোল প্যান্টের পকেট থেকে। একখিলি পান আমাকেও অফার করা হল। প্রত্যাখ্যান করলাম সবিনয়ে। জগন্নাথ দাস পানটা গালে ঠুসে পিচ সামলাতে সামলাতে উর্ধ্বমুখে বললেন, সমাজ-কল্যাণটাও আমাদের দেখতে হয়, তাই আপনাকে দাঁড় করালাম।

ভুরু কুঁচকে বললাম, স্পষ্ট করে বললে ভাল হয়।

পুরী বেড়াতে এসেছেন তো? বাজে ঝামেলায় জড়াবেন না।

মানে?

মালিনী পোদ্দারের সঙ্গে মেলামেশা করবেন না।

কেন?

ওর ওপর আমাদের নজর আছে বলে।

কণ্ঠস্বরকে আর মোলায়েম রাখতে পারলাম না। রূঢ় স্বরেই বলে ফেললাম, কারণটা জানতে পারি?

মেয়েটা ভাল নয়!

ধন্যবাদ। আমার ভাল আমি নিজে বুঝি!

মেলামেশা তাহলে চালিয়ে যাবেন?

এক কথা আমি দুবার বলি না!

ঝামেলা ডেকে আনছেন কিন্তু।—পচ করে খানিকটা পিচ ফেললেন জগন্নাথ দাস।

বিষদৃষ্টি হেনে পা চালালাম হোটেল অভিমুখে।

কোন কোন ঘটনা বড় দ্রুত ঘটে যায় মানুষের জীবনে—রেস হর্সের মত বায়ুবেগে ধেয়ে যায় লক্ষ্য অভিমুখে—ছকে বাঁধা মন্থর জীবন-কাব্যে এ এক আশ্চর্য দ্রুত ছন্দ। আমার জীবনে মালিনীও নিয়ে এল সেই দ্রুতি, সেই পবনগতি। জীবনে রোম্যান্স কাকে বলে কখনো অনুভব করি নি। বিধবা মালিনী তার বিষাদ-করুণ নয়ন দিয়ে সেই হৃৎপিণ্ড উত্তাল করা রোম্যান্সের স্বাদ এনে দিল আমার জীবনে। সহসা—নিতান্তই সহসা উপলব্ধি করলাম এতগুলি বছর নিঃসঙ্গ কাটিয়েছি জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গিনীর সাক্ষাৎ পাই নি বলে। মালিনীই সেই সঙ্গিনী—সহধর্মিণী হওয়ার সমস্ত যোগ্যতা নিয়ে এই আদিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে সে এসেছে আমার সামনে, এ মিলন বিচ্ছেদের মধ্যে শেষ হতে দেব না আমি—কখনোই না।

ফটো তোলার হবি ছিল। সৈকত সুন্দরীর ছবি তুললাম। সেই ছবির এক কপি রাখলাম পকেটে, আর এক কপি রাখলাম আমার

ঘরে খাটের পাশে টেবিলের ওপর। ভালবাসা কাকে বলে, সেই প্রথম সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে উপলব্ধি করলাম। একটি আশ্চর্য আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি অণু পরমাণুকে উদ্বেলিত করে তুলল। এ আকাঙ্ক্ষা মালিনীকে দেখার, তাকে পাশে নিয়ে বসে থাকার, তার সঙ্গে বিভিন্ন আলাপে নিমগ্ন হয়ে থাকার।

মালিনীর আর আমার নিভৃত নিকেতন দুটির মধ্যে দূরত্ব খুব বেশি নয়। দুজনে দুজনের বাড়ি যাতায়াতও চালিয়ে গেলাম। এইভাবেই গেল আরও সাতটা দিন। কিন্তু এই সাতদিনের প্রতি দিন রাতের প্রতিটি মুহূর্তে অশান্ত অন্তরে উপলব্ধি করলাম আরও একটি হৃদয়-মোচড়ানো সত্য: আমি মালিনীকে চাইলেও মালিনী যেন আমাকে চায় না। মেলামেশার মধ্যেও একটা অদৃশ্য প্রাচীর ধরে রাখতে চায়, আমার আর তার মধ্যে। ফলে, মনের কথা মন খুলে বলতে পারলাম না। মালিনী রয়ে গেল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এ কি তার সুগভীর বেদনাবোধের জন্যেই? এর পরেই একদিন হোটেলে খেতে গিয়ে টেলিফোন পেলাম পুলিশ দপ্তর থেকে।

ডাক্তার নাকি?

চেনেন আমাকে? বললাম অবাক হয়ে।

হাড়ে হাড়ে চিনি। আমি বিপ্লব বসু।

বিপ্লব! স্মৃতির পাতা উল্টে গেলাম। দ্রুত। বিপ্লব বসু—নাটক পাগল বিপ্লব বসু?

আরে হ্যাঁ। এখন জীবন নাটক নিয়ে ব্যস্ত। পুলিশের কাজ তো।

বিপ্লব বসু আমার বাল্যবন্ধু। এক পাড়ার ছেলে। সুরী লেনে কম কাণ্ড করি নি দুজনে। আইবুড়োমন্দিরের সদস্য ছিল। নাটক করতে পারলে আর কিছু চাইত না। বিপ্লব আই-পি-এস হয়েছে জানতাম। কিন্তু পুরীতে পোস্টিং হয়েছে জানতাম না।

বিপ্লব, আমার ঠিকানা পেলি কোত্থেকে?

জগন্নাথ দাসের কাছ থেকে।

ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সেই লোকটা ?

ঝুঁদে অফিসার রে। তোর ভালও করতে পারে, খারাপও করতে পারে।

জানি। ভাল করতে একবার এসেছিল। তুই কি করতে চাস ?

একই উদ্দেশ্য। মালিনীর ছায়া আর মাড়াস নি।

কেন মাড়াবো না ?

মেয়েটা ভাল নয় বলে।

আর কিছু বলার আছে ?

বোম্বাইয়ের ফিল্ম লাইনে এক্সট্রা ছিল এই মালিনী। নাচতে পারে ভালই—নাচাতেও পারে। অভিনয়টাও ভাল জানে। তার চাইতেও বড় গুণটা কি জানিস ?

তাড়াতাড়ি বল।

মালিনী ব্ল্যাকমেলার।

ওয়াণ্ডারফুল ! আর কিছু ?

মালিনীর স্বামী শেষ পর্যন্ত—

থামলি কেন ? শেষ কর।

সুইসাইড করে বেঁচেছে।

রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

গুম হয়ে বসে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ নিজের টেবিলে ফিরে এসে। আমি যে এখানে খেতে এসেছি, তা নিশ্চয় জগন্নাথ দাসই জানিয়েছে বিপ্লবকে। কোথায় সে ?

মুখ তুললাম ভাতের থালার ওপর থেকে। প্রতিটি টেবিলে দৃষ্টি বুলিয়ে গেলাম। ফরেন ট্যুরিস্টের ভিড়ই বেশি। দিব্বি ভাত ডাল মাছ চচ্চড়ি খাচ্ছে হাত দিয়ে মেখে মেখে। এককোণে বসে পান

চিবোচ্ছেন জগন্নাথ দাস।

দেখেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার। ঠিক তখনই যেন হঠাৎই আমার ওপর চোখ পড়ল জগন্নাথ দাসের। দুই চোখ কপালে তুলে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে লাফ দিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে। হন্তদন্ত হয়ে এসে ধপাস করে বসে পড়ল আমার টেবিলের সামনে।

বললে, আপনক টিকিয়ে কাম থিলা।

শক্ত গলায় বললাম, মানে?

এই দেখুন! আপনি তো আবার ওড়িয়া জানেন না। বললাম আপনার সঙ্গে একটু কাজ ছিল।

কাজের কথা তো হয়েই গেল টেলিফোনে।

একগাল হেসে জগন্নাথ দাস বললেন, বস ফোন করেছিলেন বুঝি?

চোয়ালের হাড় শক্ত করে জগন্নাথ দাসের গোমস্তা টাইপের মুখখানা ভাল করে নিরীক্ষণ করে নিয়ে বললাম, আপনার বস্‌কে একটা কথা বলে দেবেন?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনার বাল্যবন্ধু যখন—

বলে দেবেন, বলে একটু থামলাম। তারপর—মালিনী পোদ্দারকে আমি বিয়ে করব ঠিক করেছি।

চোয়াল ঝুলে পড়ল জগন্নাথ দাসের। পান-জর্দা-কলঙ্কিত দাঁতগুলো দেখে গা ঘিনঘিন করে উঠল আমার। উঠে পড়লাম টেবিল ছেড়ে।

মালিনী বাড়িতেই ছিল। খাটে বসে ইয়া মোটা একটা বই পড়ছিল। আমি ঘরে ঢুকতেই উপুড় করে রাখল বইটা। দেখলাম, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত—বসুমতীর বই।

বললাম, কিছু মনে করবেন না, খাটেই বসছি।

পা গুটিয়ে নিয়ে মালিনী বলল, বসুন না।

আমি বললাম, আমার বয়স এখন চল্লিশ। আপনার?

অবাক হয়ে মালিনী বললে, আটাশ।

বারো বছরের বড় আপনার চেয়ে। খুব বেমানান হবে না।

স্থির চোখে চেয়ে রইল মালিনী।

আমি বললাম, আমাদের এই বয়সে ন্যাকামি মানায় না। জিভের জড়তাও আমাদের থাকে না। তাই সোজাসুজি বলছি। আমাকে বিয়ে করবেন?

মুখটা কিরকম হয়ে গেল মালিনীর।

আমি বললাম, কলকাতায় আমার পশার ভাল, ব্যাঙ্কে দু'লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট আছে, মুচিপাড়ায় একটা বাড়ি আছে, আর গ্যারাজে একটা অ্যামবাসাডার আছে। পাত্র হিসেবে আমি কি খুব খারাপ?

মালিনী চোখ নামিয়ে নিল। ভারি ভাল লাগল ওর লজ্জাকরুণ মুখখানি। আমি বললাম, আমি মনের ডাক্তার। মানুষের মনের খবর টেনে বার করি। পারি নি কেবল আপনার ক্ষেত্রে। তাই সারেণ্ডার করছি। রাজী কিনা বলুন।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে ছেড়ে দিল মালিনী। মুখ টিপে হেসে বললে, মুখে না বললে বুঝতে পারেন না?

দু'হাতে মালিনীর দু'হাত তুলে নিয়ে একটু চাপা গলায় বললাম, এই আমাদের পাকা দেখা।—খাট থেকে নেমে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। বললাম, এখন কি জানতে পারি ব্যাঙ্কে কত টাকা ফিক্সড ডিপোজিটে রেখেছেন?

আমার দিকেই চেয়েছিল মালিনী। চোখে চোখ রেখে বললে, আপনাকে বলা যায়, কারণ আমার টাকার খবর না নিয়েই পাকা দেখা সেরে নিলেন। সামান্যই টাকা আছে ব্যাঙ্কে।

কত?

সাড়ে চার লাখ।

দশ পার্সেণ্ট সুদ ধরলে বছরে পঁয়তাল্লিশ হাজার। মাসে তিন

হাজার সাতশো পঞ্চাশ। পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দেওয়া যায় এই টাকায়। তা সত্ত্বেও আপনি আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন, নিশ্চয় টাকার লোভে নয়?

পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ম্যালিনী বললে, সমুদ্রে ডুব দিয়ে আসুন, মাথা ঠাণ্ডা হবে।

হনহন করে সমুদ্রের ধার দিয়েই হেঁটে চললাম বি-এন-আর হোটেলের দিকে। বিপ্লব বসু পয়লা নম্বরের ইডিয়ট। বৃথাই আই-পি-এস হয়েছে। মালিনী সম্বন্ধে এত বড় ভুল করল কি করে? মালিনী ব্ল্যাকমেলার? মালিনী নর্তকী? মালিনী অভিনেত্রী?

বিপ্লবের কাছে স্পষ্টাস্পষ্টি জানতে হবে, মালিনীর পেছনে চর মোতায়েন করেছে কেন। অপরাধটা কী? স্বামীর সুইসাইড? না, ব্লাকমেলিং? মালিনীকে প্রোটেক্ট করার দায়িত্ব আমারই—আমি তার হবু বর।

এই চিন্তা নিয়ে এমন তন্ময় হয়ে ছিলাম যে লক্ষ্য ভেদ করার সময়ে অর্জুনের মতই চোখে পড়ছিল না ডাইনের সমুদ্র আর বাঁয়ের জটলা। হাসি-হুল্লোড় সমুদ্রের গর্জন। ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ—কিছুই সাড়া জাগাচ্ছিল না মস্তিষ্কে। ভালবাসা কাকে বলে কোনদিন বুঝি নি। ভাবতাম এটা একটা ব্যায়রাম। মনের বিকার। সেই ভালবাসাই সেই মুহূর্তে যে প্রচণ্ড আবেগ আর উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল আমার মধ্যে, বোধ হয় শাজাহানও সেরকমটি কখনো টের পান নি।

তাই আমার পেছনে এক যুবতী দৌড়চ্ছে আর আমার নাম ধরে ডাকছে অনেকক্ষণ ধরে, খেয়ালই করি নি। খেয়াল হল যখন পেছন থেকে এসে সে খপ করে আমার বাহু চেপে ধরে বললে হাঁপাতে হাঁপাতে, বলি কোন জগতে আছেন?

ভীষণ চমকে উঠলাম। আমার মুখোমুখি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে অস্বাভাবিক ঢাঙা মিশকালো রঙের একটি মেয়ে। পাঞ্জাবী

মেয়েদের মধ্যে এহেন দৈর্ঘ লক্ষ্য করা যায়—গড়ন পেটনও চমৎকার। যেন কালো পাথর খোদাই করা একটি মূর্তি—কোনারকের সূর্য মন্দিরের গা থেকে প্রাণ পেয়ে সড়াৎ করে নেমে এসেছে। টাইট ব্লু-জীনস আর ঢিলেহাতা ডীপ রেড শার্ট পরা মেয়েটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত মদিরতা মাখানো। সাক্ষাৎ ব্ল্যাক বিউটি।

কালো মুখে সাদা দাঁতের ঝিলিক মেরে সে বললে, চিনতে অসুবিধে হচ্ছে নাকি?

ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগল বৈকি। তারপর বললাম, সুরমা যে! কর্তা কোথায়?

ওই তো।—পেছন দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে সুরমা, ওই তো, দ্যাখো, দ্যাখো, তোমার বাসুদাকে ভূতে পেয়েছে মনে হচ্ছে।

সুরমা আর গোবিন্দর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল বড় বিচিত্র ভাবে। আমি বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীর মেম্বার। একদিন একটা বইয়ের পুস্তনিতে দেখলাম মেয়েলী হাতে লেখা একটা টেলিফোন নাম্বার। তলায় লেখা 'ডায়াল ফর ফ্রেণ্ডশিপ'।

বইয়ের মার্জিনে বা পুস্তনিতে বিদ্যে জাহির করা বা পৃষ্ঠার কোণ মোড়া আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। মেয়েটিকে তাই শিক্ষা দেওয়ার বড় ইচ্ছে হয়েছিল। ডায়াল করেছিলাম নাম্বারটি, কানেকশানও পেয়েছিলাম তক্ষুণি, কিন্তু ক্যালকাটা টেলিফোনস-এর অসাধারণ এফিসিয়েন্সির ফলে ক্রশ কানেকশন হয়ে গিয়েছিল। একটি ছেলে আর একটি মেয়ের সরস কথাবার্তার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। কথা বলে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাই নি বলে চুপ করে ছিলাম। রিসিভার নামিয়ে রাখতেও ইচ্ছে যায় নি। দু-মিনিট যেতে না যেতেই বুঝলাম, পুরুষ কণ্ঠের অধিকারী কোন এক শুভলগ্নে আমারই মত বইয়ে টেলিফোন নাম্বার এবং বন্ধুত্বের আহ্বান পেয়ে 'ডায়াল ফর ফ্রেণ্ডশিপ' করেছিল। তারপর জল অনেক দূর গড়িয়েছে। দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। মন দেওয়া নেওয়াও হয়ে গেছে।

এখন বাকি কেবল মালাবদল। তারও আর বেশি দেরি নেই।

গলা খাঁকারি দিয়ে অবশেষে বলেছিলাম, সুখী হও।

কে?—চমকে উঠেছিল নারীকণ্ঠের অধিকারিণী।

এ ফ্রেণ্ড।—বলেছিলাম আমি। বইয়ের টেলিফোন নাম্বার পেয়ে ধমক টমক দেওয়ার জন্যে ফোন করেছিলাম।

লাইব্রেরীর কেউ নাকি? শঙ্কিত কণ্ঠে বলেছিল মেয়েটি।

না। মনের ডাক্তার। বাসুদেব সাহা।

বইখানা আপনার কাছে এখনও আছে?

আছে।

দয়া করে নাম্বারটা কেটে দেবেন?

আর দরকার নেই বলে?

না। কত খুঁজছি, কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছি না বইখানা। কেটে দেবেন? প্লীজ।

দেবো—কিন্তু একটা শর্তে।

কি শর্ত বলুন?

তোমাদের দুজনকেই আমার চেম্বারে আসতে হবে। আশির্বাদ করব।

ঠিকানা দিন।

ঠিকানা দিয়েছিলাম। নির্দিষ্ট সময়ে চেম্বারে এসেছিল সুরমা আর গোবিন্দ। দুজনেই তালঢ্যাঙা। দুজনেই কালো। সুরমা ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনি পাবলিক স্কুলে পড়ত দিল্লিতে। কলকাতায় এসে পড়ছে যাদবপুরে। গোবিন্দ সেণ্ট জেভিয়ার্স থেকে বেরিয়ে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়ে ফরেন পাবলিশার্স সিণ্ডিকেটের মার্কেটিং ম্যানেজার। সুরমার বয়স বাইশ, গোবিন্দর আটাশ। সুরমার জীবন বড় অদ্ভুত। বাবা ছিলেন পাইলট, মা এয়ার হোস্টেস। প্লেন ক্র্যাশ হওয়ায় একদিনেই বাবা মা স্বর্গারোহন করেন। বাবার বন্ধু এক অস্ট্রেলিয়ান সাহেবের কাছে বারো বছর বয়স থেকে মানুষ হতে

থাকে সুরমা। শিক্ষাদীক্ষা তিনিই দিয়েছেন। সিডনি ইণ্ডাস্ট্রীজের দিল্লি ব্র্যাঞ্চের ম্যানেজার ছিলেন কর্নেল ম্যালকট। বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান। সুরমা গোবিন্দর শুভ-পরিণয়ে তাঁর কোন আপত্তি নেই।

সেই সুরমাই খুশি-উচ্ছল চোখে দাঁড়িয়ে আমার সামনে। বিয়ের জল পড়ায় শরীরের রেখাগুলো মোটেই ভোঁতা হয় নি।

বললাম, ডাকো গোবিন্দকে।

পেছন ফিরে হাত নেড়ে ডাকল সুরমা। দীর্ঘদেহী গোবিন্দ প্যাণ্টের বালি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল। টল, স্মার্ট, হ্যাণ্ডসাম। যেন কালো ইস্পাতের বাঁকা তলোয়ার।

কাছে আসতেই বললাম, ফ্যামিলি প্ল্যানিং চালিয়ে যাচ্ছো মনে হচ্ছে?

মুখ টিপে হাসল গোবিন্দ। সুরমা কলকলিয়ে বললে, বুড়ো বিয়ে করলেই হত।

কি হত? বাচ্চা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।—চোখ মুখ ঘুরিয়ে নিলাজ কণ্ঠে বললে সুরমা, ছোঁড়াগুলো বড্ড হিসেবী।

গোবিন্দ এবার আর হাসল না।

দুজনে দুটি চরিত্র। সুরমার ভেতরে গভীরতা কম, উচ্ছলতা বেশি। যা মুখে আসে, তাই বলে ফেলে। তলিয়ে ভাবে না। গোবিন্দ বিপরীত প্রকৃতির মানুষ। হিসেবী কথাবার্তা, উচ্ছলতার চাইতে গভীরতা বেশি।

দেখছি, বিয়ের তিন বছর পরেও একটুও পাল্টায় নি দুজন। গোবিন্দ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্যেই যেন বললে, আসুন আমাদের আস্তানায়।

সেটা কোথায়?

পান্থনিবাসের পেছনে।

বিপ্লবকে একহাত নেওয়া মুলতুবি রাখলাম। বললাম, চলো।

পাশাপাশি তিনজনে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে সুরমা বললে, আচ্ছা বাসুদা, মানুষ খুন করবার ইচ্ছেটা কি একটা মানসিক রোগ?

এ আবার কি প্রশ্ন? বললাম আমি।

সুরমার স্বভাবই এই রকম। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যায়—আগের কথা খেয়ালও থাকে না।

বলুন না, মানসিক বিকৃতি থেকেই কি খুন করার স্পৃহা জাগে?

সেটা নির্ভর করছে অনেক ফ্যাক্টরের ওপর। কেন, তোমার কাউকে খুন করার ইচ্ছে হচ্ছে? লঘুভাবেই বললাম কথাটা।

দমকা হাসিতে শতধা চূর্ণ হয়ে সুরমা বললে, হচ্ছে বৈকি।

কাকে? আমাকে কি?

না, না। আপনি তো নিরামিষ।

তবে কাকে সুরমা?

গোবিন্দকে। পুরুষ মানুষ হবে বেপরোয়া—লক্ষ্মীছাড়া। বড্ড নিয়ম আর শাসনের মধ্যে চলে—তাই ইচ্ছে করে—

সুরমা! এই প্রথম ভুরু কুঁচকে কণ্ঠস্বর কঠিন করল গোবিন্দ।

ব্যাপার কি? ওদের সম্পর্কে এই তিন বছরেই ফাটল ধরেছে নাকি? সুরমা এত লঘুমতি এবং চপল চঞ্চল—কোন কথায় কার আঘাত লাগে, তাও বুঝতে পারে না।

সুরমার মন ততক্ষণে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছে। হৈ হৈ করে বলে উঠল, দ্যাখো, দ্যাখো, বাচ্চাটার কাণ্ড দ্যাখো!

ফুটফুটে একটি ইউরোপীয় বাচ্চা বালির ওপর শুয়ে সমস্ত দেহটা বালি দিয়ে ঢাকছে—মুখখানা কেবল বেরিয়ে রয়েছে বালির বাইরে। পাশেই বসে হাসছে তার বাবা আর মা।

গোবিন্দ হেঁট হয়ে বাচ্চাটার দু-গাল টিপে দিয়ে বললে, নটি বয়!

পান্থনিবাসের পেছনে সাজানো গোছানো চমৎকার হলিডে হোমে আস্তানা নিয়েছে সুরমা আর গোবিন্দ। চব্বিশ ঘণ্টার ঝি-চাকর ছাড়াও আছে টেলিফোন এবং গ্যারেজে গাড়ি। হলিডে হোম নামেই—আসলে একটা অফিস। এখান থেকেই কলিঙ্গ মার্কেটিং পরিচালনা করে গোবিন্দ।

কফি আর কাজু বাদাম নিয়ে বসেছি আমরা তিনজনে, এমন সময়ে একটা সাইকেল রিক্সা এসে থামল বাড়ির সামনে। নামল এক বৃদ্ধা। পরনে কালাপেড়ে শাড়ি। গায়ের রঙ খুব ফর্সা। প্রতিমার মত বড় বড় চোখ। এককালে ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন নিশ্চয়। বনেদিয়ানার ছাপ চোখে মুখে চলনে বলনে।

গোবিন্দ উঠে পড়ল—পিসিমা এসেছেন।

ঘরে ঢুকলেন বৃদ্ধা। বয়স সত্তরের কাছাকাছি নিশ্চয়। কিন্তু শিরদাঁড়া এখনো সিধে। ঘরে ঢুকলেন সহজভাবে, কিন্তু সুরমাকে দেখেই যেন একটু শক্ত হলেন। আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই পরিচয় করিয়ে দিল গোবিন্দ।

বললে, বাসুদা, পিসিমা পুরীতেই শেষ জীবন কাটাবে বলে এখানে বাড়ি কিনেছে।

পিসিমা বললেন, তোরা গল্প করছিস কর, আমি উঠি। একটু আগে ফোন করেছিলাম, তোরা বাড়ি ছিলি না। তাই নিজেই এলাম। আজ রাত ন'টার সময়ে তুই আর সুরমা আমার বাড়ি আসবি। কথা আছে।

কি কথা, পিসিমা ? শুধোল গোবিন্দ।

গেলেই বুঝবি।—আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গিয়ে রিক্সায় উঠে বসলেন পিসিমা।

ঘরের আবহাওয়াটা কিন্তু পাল্টে দিয়ে গেলেন। সুরমার মত মেয়েও গুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অকারণে কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলে সুরমা বললে, টাকার গরমে মাটিতে আর পা পড়ছে

না বুড়ির।

আঃ, সুরমা! গোবিন্দর স্পষ্টত বিরক্তি।

থামো তুমি! বুড়ির সব সম্পত্তি তুমি পাবে তো—তাই কোন দোষ দেখতে পাও না! চোখ রাঙানির ধার ধারি না আমি।

সুরমার মুখে ঠিক এ ধরনের কথা তো কখনো শুনি নি? ব্যাপার কী? রাগে যেন ফুটছে মেয়েটা।

আমার সামনে আর দাম্পত্য কলহের মধ্যে গেল না গোবিন্দ। চালাক ছেলে। জোর করে মুখের বিরক্তি মুছে ফেলে বললে, চলুন বাসুদা, আপনি কোথায় থাকেন দেখে আসি।

চলো। সুরমা, তুমিও এসো।

সুরমা যেন পা বাড়িয়েই ছিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন।

হেঁটেই গেলাম তিনজনে। শ্মশানের পেছনকার রাস্তা ধরে গল্প করতে করতে অতখানি পথ চোখের নিমেষে ফুরিয়ে গেল। সুরমা আবার উচ্ছল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আবার হাসছে, খুনসুটি করছে। গোবিন্দকে রাগিয়ে দিচ্ছে। আমার বালি ঢাকা বাড়ির সামনে এসে বললে, ওরে বাবা! এ যে ভূতুড়ে বাড়ি।

খিড়কির দরজার পাশ দিয়ে, বালি ঢাকা পাঁচিলের গা দিয়ে সমুদ্রের দিকের সদর দরজার দিকে এগোতেই দেখলাম সদর দরজা পেরিয়ে হনহন করে বেরিয়ে এল মালিনী। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল ওর বাড়ির দিকে।

মালিনী।

মালিনী কিন্তু দাঁড়াল না। আমার ডাক শুনেও যখন দাঁড়াল না, তখন আর ডাকাডাকি করলাম না। নির্জনতাপ্রিয় মেয়েটা এসেছিল শুধু আমার সঙ্গেই দু-দণ্ড কাটিয়ে যেতে! সঙ্গে আরো দুজন আছে দেখে চলে যাচ্ছে যখন—যাক। তাছাড়া, ও এখন যে-কথা বলবে, তা গোবিন্দ-সুরমার সামনে বলা যায় না।

দেখতে দেখতে উঁচু বালির আড়ালে হারিয়ে গেল ওর ধবধবে

শাড়ি জড়ানো তন্বী মূর্তি।

পাশ ফিরে বললাম, এসো সুরমা।

বলেই থমকে গেলাম। মুখখানা যেন কিরকম হয়ে গেছে সুরমার। উচ্ছলতা চপলতা অন্তর্হিত হয়েছে। অনিমেষে চেয়ে আছে মালিনীর গমন পথের দিকে।

বাসুদা, ও কে?

ঘরে চলো, বলছি।

দুজনকে বসালাম ঘরে। বললাম, মালিনী কে এবং কি হচ্ছে যাচ্ছে। আমার ঘরণী।

টেবিলের ওপর থেকে সদ্য তোলা ফটোটা এনে ধরলাম সুরমার সামনে—পছন্দ হচ্ছে ভাবী বৌদিকে?

চোখের ভুল কিনা বলতে পারব না, কিন্তু যেন সমস্ত রক্ত নেমে গেল সুরমার মুখ থেকে।

এর পরের ঘটনা-স্রোত এগিয়ে চলল অত্যন্ত দ্রুত বেগে।

যাবার সময় গোবিন্দ বলে গেল, রাতের খাওয়াটা তার ওখানেই খেয়ে আসতে হবে আমাকে—কোন আপত্তি চলবে না। আমিও এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম শুধু একটা বিষয় পরিষ্কার করার জন্যে। মালিনীর ফটোগ্রাফ দেখার সঙ্গে সঙ্গে অত বিমনা হয়ে গেল কেন সুরমা? যেতে যেতে ব্যাপারটা জানতে হবে। পিসিমার সঙ্গে ওদের কথাবার্তা আছে ন'টায়। দশটার মধ্যেই ফিরে আসবে'খন।

সন্ধ্যে হলো। একা একা ভাল লাগছিল না। গেলাম মালিনীর বাড়িতে। বাড়ি খালি। নিশ্চয় কোথাও বসে আছে একাকিনী। সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম এক জায়গায়। অন্ধকার সৈকতে এখন কেউ নেই। ঢেউয়ের সাদা মাথার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি। তন্ময় হয়ে রয়েছি পর পর ঘটে যাওয়া অনেকগুলো গূঢ় ব্যাপার নিয়ে। ভালোবেসে বিয়ে করেছে

সুরমা আর গোবিন্দ। অথচ ওদের সম্পর্কে কোথায় যেন একটা চিড় খেয়েছে—সুরমা পরিহাসছলে বলছে গোবিন্দকে খুন করতে ইচ্ছে যাচ্ছে—মনোবিজ্ঞানীর কাছে কিন্তু এই ধরনের কথার মধ্যেই অবচেতন মনের চেহারা ধরা পড়ে। গোবিন্দর পিসিমা যে সুরমাকে পছন্দ করেন না, তাও স্পষ্ট হয়ে গেছে আমার কাছে। সুরমা দু'চক্ষে দেখতে পারে না পিসিমাকে—অথচ পিসিমার সমস্ত সম্পত্তি পাবে তারই স্বামী। সুরমা মালিনীর আদল দেখে প্রথমে কাঠ হয়ে গেছল—পরে ছবি দেখে ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মালিনীও ওদের দেখেই মুখ ফিরিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, এখনও পাত্তা নেই। কেন? এরা কি আগে থেকেই চেনে পরস্পরকে? মেয়েদের মন দেবা ন জানন্তি। কেন দুজনে দুজনকে দেখতে পারছে না? মালিনীকে আমি দেখে বুঝেছি তার মত মেয়ে সংসারে বিরল। কিন্তু বিপ্লব বলছে তার স্বামী আত্মহত্যা করে বেঁচেছে। সে নর্তকী ছিল, অভিনয়কে পেশা করেছিল—জীবিকা করেছিল আরও একটি বিদ্যেকে—

ব্ল্যাকমেলিং! কানের কাছে ফিসফিস করে কে যেন বলল।

দারুণ চমকে উঠে পেছন ফিরলাম। নিঃশব্দে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে জগন্নাথ দাস। অন্ধকারেও তারার আলোয় দেখা যাচ্ছে তার কদাকার মূর্তি।

মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার—আবার এসেছেন! গেট আউট।

মোলায়েম গলায় জগন্নাথ বললে, খ্যামোকা রেগে যাচ্ছেন স্যার। ব্ল্যাকমেলিং চলছে পুরোদমে—বলতে এলাম, অমনি রেগে গেলেন।

গেট আউট।

যাচ্ছি স্যার, যাচ্ছি—কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন। আপনার বন্ধু ওই গোবিন্দবাবুকে তো দুয়ে মুসে শেষ করে দিচ্ছে মালিনী পোদ্দার।

গেট আউট !

ব্ল্যাকমেলিং ! ব্ল্যাকমেলিং ! ব্ল্যাকমেলিং ! বলতে বলতে দামাল হাওয়ায় উড়ন্ত শার্ট সামলাতে সামলাতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল জগন্নাথ দাস।

সমুদ্র গর্জনের নিরন্তর হাহাকারে ডুবে গেল ভয়ানক কথাটা। বিপ্লব যেভাবে ফেউ লাগিয়েছে আমার পেছনে, বন্ধু বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী।

নির্জনে বসে মনের সঙ্গে কথা বলার আমেজটুকুই মাটি করে দিয়ে গেল বিদঘুটে প্রাণীটা। উঠে পড়লাম। যদিও ন'টা বাজতে এখনো অনেক দেরি। তাহলেও আগেভাগে গিয়েই বরং বসে থাকি গোবিন্দর হলিডে হোমে। ওখানে টেলিফোন আছে। বিপ্লবের পিণ্ডি চটকাবো টেলিফোনে।

পাম্থনিবাসের পেছনে হলিডে হোমে আলো জ্বলছে দেখলাম দূর থেকে। গোবিন্দ তাহলে আছে।

ঢুকলাম ঘরের মধ্যে। গোবিন্দ বসে আছে সোফায়—পাশে সুরমা। সামনের সোফায় যাকে বসে থাকতে দেখলাম, তাকে এখানে দেখব আশা করি নি।

নির্জন সৈকতে হাফপ্যাণ্ট পরা প্রায় বৃদ্ধ সেই অস্ট্রেলিয়ান সাহেবটি। চোখ যার নীল, ঠোঁটের কোণে হাসি লেগেই, চোখে মুখে প্রজ্ঞার ছাপ। এখন অবশ্য সাহেবের পরনে হাফপ্যাণ্ট নেই। আছে ঢিলে পায়জামার মত ট্রাউজার্স আর ঘন নীল রঙের বুশ শার্ট।

আমি ঢুকেই থমকে গিয়েছিলাম। গোবিন্দ সোল্লাসে বললে, আসুন, আসুন, আলাপ করিয়ে দিই। আমার শ্বশুরমশাই কর্নেল ম্যালকট। ইনি ডক্টর বাসুদেব সাহা—যাঁর কথা আপনাকে বলেছিলাম।

কর্নেল ম্যালকট দু-হাত তুলে নমস্তে করে আমাকে চমকে দিয়ে

বললেন ভাঙা-ভাঙা বাংলায়—আগেই দেখা হয়েছে আমাদের।

গোবিন্দ চোখ কপালে তুলে বললে, কোথায় ?

আমি নির্নিমেষে দেখছিলাম কর্নেল ম্যালকটকে। মহান পুরুষ! বাল্যবন্ধুর অপঘাত মৃত্যুর পর বন্ধুকন্যাকে মানুষ করার মত মানুষ এ-সংসারে অতি বিরল। কর্নেল ম্যালকটের অনেক কথাই শুনেছি সুরমা আর গোবিন্দর মুখে—আলাপ হয় নি ভদ্রলোক তখন দিল্লিতে ছিলেন বলে।

বললাম, সমুদ্রের ধারে। রোজ দাঁড়িয়ে থাকেন।

ইয়েস। ইয়েস। বড় নির্জন জায়গা। বড় ভাল লাগে। মিটিমিটি হেসে বললেন কর্নেল।

আমি বললাম গোবিন্দকে: কিভাবে তাঁকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, কিন্তু দিল্লি ছেড়ে উনি পুরীতে কি বেড়াতে ?

ও নো।—বললেন কর্নেল, বাড়ি কিনেছি এখানে। শেষ জীবনটা এখানেই থাকব।

রিয়্যালি!—অবাক না হয়ে পারলাম না। পুরীতে আজকাল অস্ট্রেলিয়ানরা যেন বড় বেশি গিজ গিজ করছে। ইউথ হোস্টেল ভরে গেছে অস্ট্রেলিয়ান ট্যুরিস্টে। কর্নেল ম্যালকট কিন্তু স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন।

ঘড়ি দেখে উঠে পড়ল গোবিন্দ—বাসুদা, আপনার কাজ না থাকলে বসে থাকুন। মার্কেটে একটু কাজ আছে—ওখান থেকে পিসিমার বাড়ি যাব নটায়। সুরমা এখান থেকেই যাবে। কর্নেল, আমি এগোই।

উইশ ইউ বেস্ট অফ ইওর লাক।—হাসলেন কর্নেল।

কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল গোবিন্দ। ব্ল্যাকস্টিল সোর্ডের মত বডিখানা বেঁকিয়ে বিদায় নিল ঘর থেকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম আমি, সুরমা আর কর্নেল। তারপর কথাবার্তা জিইয়ে রাখার জন্যেই সুরমা উচ্চকণ্ঠে আবার শুরু

করল আমার গুণকীর্তন। মনের ডাক্তারি করে আমি বিরাট পশার জমিয়েছি নাকি কলকাতায়। কত মানুষ এসে মনের দরজা হুহাট করে দেয় আমার সামনে—মনের ময়লা উপুড় করে দেয় আমার মনের ওপর। নীলকণ্ঠ বাসুদেব সাহা সবার মনকে নির্মল করে দিয়ে বসে থাকে গরলের ভাগটুকু নিয়ে।

সুরমার স্বভাবই এই। যখন যা বলবে, মাত্রা ছাড়িয়ে চলে যাবে। পুব-পশ্চিম স্টাইলে কথা বলা। খুশিতে প্রাণ গড়ের মাঠ হলে যা হয় আর কি।

কর্নেল ম্যালকট কিন্তু আর একটি কথাও বললেন না। শুধু শুনে গেলেন। কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আবার দেখা হবে।

বেরিয়ে গেলেন কর্নেল। আমি তাঁর গমন পথের দিকে চেয়ে রইলাম। বুঝলাম, এদের তিনজনের মধ্যে যে-কথা হচ্ছিল, তা আর হল না আমার আগমনে, শ্বশুর-জামাই তাই সরে পড়লেন—সুরমা একা বসে রইল অতিথি আপ্যায়ণ করতে।

ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে আটটা বাজে। বললাম, সুরমা, এবার তুমিও এগোও। আমি এখান থেকে একটা ফোন করব।

কাকে ?

সত্যি কথা বলতে গিয়েও চেপে গেলাম। বিপ্লবকে ফোন করছি বললেই হাজার প্রশ্ন করে বসবে সুরমা। মালিনী সম্পর্কে অনেক বাজে কথাই বলতে হবে জবাবের মধ্যে। যে মালিনীকে দেখে মুখ রক্তশূন্য করে ফেলে সুরমা, তার সম্বন্ধে কোন কথা তার সামনে নয়।

বললাম, এক বন্ধুকে।

গভীরে প্রবেশ করার মত গভীরতা নেই সুরমার। তাই লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ও বললে, তাই করুন। আমি পিসি বুড়ির বকবকানি শুনেই চলে আসব।—বলে, শিস দিতে দিতে হাওয়ায় শ্যাম্পু করা ঘাড়-ছাঁটা চুল উড়িয়ে বেরিয়ে গেল সুরমা।

সেকেণ্ড কয়েক বসে রইলাম চুপচাপ।

এরা তিনজনে কি কথা বলছিল জানি না, কিন্তু বিষয়টা যে গোপনীয় তাতে সন্দেহ নেই। পিসিমাও কি বলতে এসে আমি থাকার বলতে পারে নি—এদের বাড়িতে যেতে বললেন। সেখানে যাওয়ার আগে এলেন কর্নেল ম্যালকট। গোপনীয় কথা আমার সামনেও বলা গেল না। বিষয়টা এক নয় তো? যে বিষয় নিয়ে পিসিমা ডেকে পাঠিয়েছেন, তাই নিয়ে কর্নেল ম্যালকট এসেছিলেন মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে? কিন্তু কর্নেলের সঙ্গে পিসিমার সম্পর্ক কী?

পকেট থেকে মালিনীর বি-টু এনলার্জমেন্টখানা বার করে রাখলাম টেবিলের ওপর। আমার সামনে এরা কেউ মনের কথা বলতে চায় না। অথচ দীর্ঘদিনের পরিচয় ওদের সঙ্গে—কর্নেল ছাড়া। কিন্তু মালিনী স্বল্পক্ষণের আলাপেই মন উজাড় করে দিয়েছিল আমার কাছে। মালিনী আমাকে বিশ্বাস করেছে—অকপট হয়েছে। এরা কপট সৌজন্যতা বজায় রেখে চলেছে।

তিক্ত হয়ে গেল মনটা। লো টেবিলের ওপর ফটোখানা রেখে টেলিফোন ডাইরেক্টরীটা নিয়ে এলাম ফোনের পাশ থেকে। পাতা উল্টে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ফোন নাম্বার খুঁজছি, এমন সময় জুতোর শব্দ হল দোরগোড়ায়। চোখ তুলে দেখলাম গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকছেন কর্নেল ম্যালকট।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। অবাক হলাম তাঁর সহসা আবির্ভাব দেখে নয়—তাঁর মুখের ভাব-পরিবর্তন লক্ষ্য করে। সমুদ্রের তীরে আত্মনিমগ্ন চোখে সুদূর অস্ট্রেলিয়ার পানে চেয়ে থাকার সময়েও মুখে যে হাসি দেখেছি—কিছুক্ষণ আগে এই ঘরেও যে স্মিত হাসির রেশ ঠোঁটের প্রান্তে দেখেছি—এখন তার লেশমাত্র নেই চোখে মুখে। মানুষটা যেন অকস্মাৎ আর এক মানুষ হয়ে গেছেন। গম্ভীর, গভীর, বিষণ্ণ।

ম্লান চোখে আমার চোখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, আসতে পারি ?

সুরমা তো বেরিয়ে গেল।

জানি।

ওকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন ?

হ্যাঁ। দেখেই তো এলাম। বলতে বলতে এসে আমার উল্টো দিকের সোফায় ধপ করে বসে পড়লেন কর্নেল : অবাক হচ্ছেন ?

তা হচ্ছি।

দরকারটা আপনার সঙ্গে, ডাক্তার।

আমার সঙ্গে ?

হ্যাঁ. মুখের ওপর হাত চালিয়ে নিলেন কর্নেল—সুরমা তো বলল, আপনার কাছে সবাই এসে মনের ময়লা সাফ করে যায়—আমি এসেছিলাম আমাকে দেখাতে।

কি হয়েছে আপনার ?

সেইটাই তো বুঝতে পারছি না। আমি বিপত্নীক, নিঃসন্তান। সংসারধর্মে আর আকর্ষণ নেই। কিন্তু ডাক্তার, আমি যা বলব, কথা দিন কাউকে বলবেন না ?

অবান্তর কথা বলছেন, কর্নেল। আমার পেশায় কারো কথা কাউকে বলার নিয়ম নেই।

সুরমার কাছেও বলতে পারবেন না—কথা দিন।

বিরক্ত হলাম—কথা দিলাম।

ঠিক এই সময়ে ক্রিং ক্রিং করে বাজল টেলিফোন। যাদের টেলিফোন, তারা কেউ বাড়ি নেই। তাদের শ্বশুরমশাইও টেলিফোন যন্ত্রের মুখরতায় বিলক্ষণ বিচলিত। যেন বিশেষ একটা সুরে মন-বীণার তার বেঁধে এনেছিলেন—হঠাৎ বিরস যন্ত্রের ঝনঝনানিতে তার ছিঁড়ে গেল। টেলিফোন যন্ত্রের দিকে হাতও বাড়ালেন না। বার-কয়েক ক্রিং ক্রিং হয়ে যাওয়ার পর তাই আমি উঠে গিয়ে কর্নেলের

পেছনে দাঁড়িয়ে রিসিভার তুললাম। কর্নেল একই রকম বিরসবদনে চেয়ে রইলেন সামনের লো-টেবিলের দিকে।

রিসিভারের মধ্যে দিয়ে ভেসে এল একটা আর্ত চিৎকার।

বাসুদা, বাসুদা বলছেন?

হ্যাঁ, আমি। তুমি কে?

সুরমা—সুরমা বলছি। খুন, বাসুদা, খুন।

খুন।

জুতোর শব্দে চমক ভাঙল। ঘর থেকে বেগে উধাও হয়ে যাচ্ছেন কর্নেল ম্যালকট। দৌড়ে পালিয়ে গেলেন মনে হল।

কান্না জড়ানো গলায় সুরমা চিৎকার করে বলল, খুন! খুন! পিসিমা খুন হয়ে গেল।

কি বলছো সুরমা? কে খুন করল?

সে—সে—যার ফটো দেখালেন আমাকে…

মালিনী।

নাকঝাড়ার প্রচণ্ড আওয়াজ হল দোরগোড়ায়। রুমালে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে ঘরে ঢুকছে জগন্নাথ দাস।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই আবাগীর বেটি!…

কনভেণ্টে শিক্ষিতা মেয়ের মুখে কি চমৎকার বিশেষণ! জগন্নাথ দাস ফোঁৎ-ফোঁৎ করে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে চেয়ে আছে আমার দিকে। তীক্ষ্ণ চাহনি।

বললাম, সুরমা, আমি আসছি। ঠিকানা কী?

ঠিকানা বলে গেল সুরমা। শুনলাম এবং মনে মনে মুখস্থ করে নিলাম। মুখে উচ্চারণ করলাম না পাছে জগন্নাথ শুনে নেয়।

রিসিভার নামিয়ে রেখে বললাম, আবার কেন এসেছেন?

আপনার গার্ল-ফ্রেণ্ড যে হেদিয়ে গেল।

শাট আপ! গেট আউট!

দরজার কাছ থেকে মালিনী বললে, ওঁকে অমন করছেন কেন?

আমি আপনার বাড়ি গেছিলাম। এই ভদ্রলোক এসে বললেন, ডাক্তারবাবুকে খুঁজছেন তো? উনি তো মিটিং করছেন। যাবেন? বলে আমাকে নিয়ে এলেন।

হাঁ করে চেয়ে রইলাম—মালিনী···আ-আপনি।

কি হয়েছে? অমন করছেন কেন?

নিরীহ স্বরে জগন্নাথ বললেন, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শুনে ফেলেছি কি হয়েছে। আপনাকে নিয়ে এলাম মিটিংয়ের মাঝে আপনাকে হাজির করে সবার চোখ খুলে দেবো বলে। কিন্তু তার আগেই দেখছি চোখ খুলে গেছে ডাক্তারবাবুর।

কি বলছেন? মালিনী বিমূঢ়।

আমি বললাম, আমাকে খুঁজছেন কেন?

মালিনী বলল, এমনি।

ফোঁৎ ফোঁৎ করে আবার নাক ঝেড়ে জগন্নাথ বলল, কেস খুব সিরিয়াস। এখুনি একটা খুন হয়ে গেল।

খুন!—মালিনী মনে হল টলে পড়ে যাবে।

স্কাউণ্ড্রেল জগন্নাথ কিন্তু তা দেখেও দেখল না। রুমাল শুদ্ধ হাত মাথায় তুলে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, কিন্তু মিস্ত্রী কি জানেন—খুন যিনি করলেন, তিনি তো আমার সঙ্গেই রয়েছেন।

দরজার পাল্লা ধরে মালিনী সামলে নিল। দুই চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে এল। পর মুহূর্তেই 'না-না-না-না' বলতে বলতে দু-পা পিছু হঠেই পেছন ফিরে দৌড়ে নেমে গেল রাস্তায়।

প্রবল ইচ্ছে হল ঠাস করে একটা চড় মারি জগন্নাথকে। মেরেই বসতাম, তার আগেই শশব্যস্ত হয়ে জগন্নাথ বললে, চলুন। চলুন! মার্ডারটা দেখে আসি?

জগন্নাথ পুরীর বাসিন্দা। রাস্তাঘাট চেনে। তাই মারধর করার ইচ্ছেটা শিকেয় তুলে ওর সঙ্গেই এসে পৌঁছলাম পুরীর মন্দিরের

অনতিদূরে একটা দোতলা বাড়িতে। নিরালা বাড়ি—রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে। জগন্নাথ সঙ্গে না থাকলে চিনে বার করতে মুস্কিল হত।

একতলায় উদভ্রান্তের মত বসেছিল সুরমা। বিস্রস্ত চেহারা। যতই সাহেবিয়ানা থাকুক, স্বচক্ষে খুন দেখলে খুব কম মেয়েই স্থির থাকে।

কি হয়েছে, সুরমা?

আমি বাড়িতে পা দিতে না দিতেই শুনলাম পিসিমা চেঁচাচ্ছেন, তুই ডাইনী! তুই বেশ্যা! তুই কুলটা! গলা চিরে সে কি চেঁচানি! শুনেই কাঠ হয়ে গেলাম। তার পরেই আবার চেঁচিয়ে উঠল পিসিমা—মেরে ফেললে! মেরে ফেললে! অঁ-অঁ আওয়াজ শুনেই হুদ্দাড় করে ওপরে দৌড়েছিলাম। দোতলায় উঠেই পিসিমার ঘরের মধ্যে দেখলাম সাদা শাড়ি পরা একটা মেয়েছেলে গলা টিপছে পিসিমার। আমাকে দেখেই মেয়েটা পিসিমার গলা ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে ওপাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। আমিও দৌড়লাম পেছন পেছন। পেছনের দরজা খোলা দেখলাম—মেয়েটাকে আর দেখলাম না।

হাঁপাতে লাগল সুরমা।

জগন্নাথ নোটবই বার করে দ্রুত নোট করছে দেখে বললাম, মেয়েটাকে তুমি চিনতে পেরেছো?

বললাম তো সেই মেয়ে—যার ফটো দেখালেন।

খকখক করে হেসে উঠে জগনাথ বললে, মালিনী পোদ্দার।

আমি আর দাঁড়ালাম না। দৌড়ে উঠে গেলাম দোতলায়। সামনের ঘরে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আছেন গোবিন্দর পিসিমা। হেঁট হয়ে নাড়ি দেখলাম। মারা গেছেন।

পেছনের দরজাটা হু-হাট করে খোলা দেখে বেরিয়ে গেলাম সেই দরজা দিয়ে। সামনেই একটা সিঁড়ি। সিঁড়ি শেষ হয়েছে একটা

দরজার সামনে। দরজায় খিল তোলা ভেতর থেকে। খিল খুললাম। সামনে বাগান। অনেক পেছনে পুরীর মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে।

ফিরে এলাম বাড়ির ভেতর। সামনের সদর দরজায় যাওয়ার পথ দোতলা দিয়ে—আর পথ নেই। তাই দোতলায় উঠে এলাম। পিসিমার ডেভবডির পাশ দিয়ে সামনের গলিপথে এসে দেখলাম একটা সিঁড়ি সোজা নেমে গেছে সদর দরজার সামনে একতলার ঘরে, আর একটা সিঁড়ি গলিপথের কোণ থেকে নেমে শেষ হয়েছে বাড়ির একদম বাইরে। রাস্তার ওপর। দরজাটা হু-হাট করে খোলা।

এই দরজা দিয়েই বেরিয়ে গেলাম। এদিক ওদিকে দেখলাম। চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। শুধু ঝিঁঝিঁর ডাক।

ফিরে এলাম দোতলায়। নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে একতলার ঘরে। গোবিন্দকে দেখলাম ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে। সুরমা চোখের জলে গাল ভাসাচ্ছে আর বলছে এইমাত্র কি ঘটে গেল। দ্রুত নোট নিচ্ছে জগন্নাথ।

আমি বললাম, জগন্নাথবাবু, আপনি এবার বিদেয় হোন।

বিদেয় হবো! সে কী স্যার! বডি না দেখেই—

অ্যাম্বুলেন্স ডাকুন। বিপ্লবকে খবর দিন। যান।

আমার কণ্ঠস্বর শুনেই নোটবই আর ডটপেন পকেটে পুরে ফেলল জগন্নাথ। বুঝল, অন্যথা হলে পরিণামটা ভাল হবে না। ও বেরিয়ে যেতেই আমি সুরমাকে বললাম, তুমি দেখেছিলে মেয়েটাকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—

পাশের দরজা দিয়ে নয়?

না, না, না—

পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার পর তুমি বাড়ির মধ্যে এসে

দরজা বন্ধ করেছিলে ?

না, না, না—

তাহলে পেছনের দরজায় ভেতর দিয়ে খিল তোলা কেন, সুরমা ?

থতমত খেয়ে চেয়ে রইল সুরমা।

আমি বললাম, আমি নিজে গিয়ে দেখে এলাম, পেছনের দরজায় খিল বন্ধ। তার মানে তুমি যা বললে, তা সত্যি নয়। ও দরজা দিয়ে কেউ বেরোয় নি।

সুরমা তেড়ে উঠে কি বলতে যাচ্ছিল, গোবিন্দ থামিয়ে দিয়ে বললে, বাসুদা, সুরমা সত্যিই বলেছে। দরজা খোলাই ছিল।

তুমি কি করে জানলে ?

আমি পেছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিলাম। খিল তুলে দিয়ে ওপরে উঠেই পিসিমার ডেডবডি দেখে ভয় পেয়ে যাই। ঠিক সেই সময়ে শুনলাম, একতলায় কাঁদতে কাঁদতে সুরমা কি যেন বলছে। একটু নামতেই দেখলাম আপনাকে আর ওই লোকটাকে। পুলিশের লোক বলেই মনে হল। তাই আপনাদের সামনে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা ঠিক হবে না মনে করে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সদর দরজা দিয়ে ঢুকেছিলাম।

বললাম, তাহলেও বলব সুরমা মিথ্যে বলছে।

কী মিথ্যে ? ঝাঁঝিয়ে উঠল সুরমা।

তুমি যখন ফোনে বললে মালিনী খুন করেছে পিসিমাকে—ঠিক সেই সময়ে মালিনী দাঁড়িয়ে আছে তোমারই বাড়ির সামনে। তারও আগে ছিল ওই পুলিশের লোকটার সঙ্গে। সুতরাং সে খুন করে নি।

থেমে থেমে গোবিন্দ বললে, তাহলে কি আপনি বলতে চান—

আমি এখন কিছুই বলতে চাই না, গোবিন্দ। কিন্তু আমি বাঁচাতে চাই দুটি নারীকে। সুরমাকে বাঁচাতে চাই সে আমার বোন বলে—মালিনীকে বাঁচাতে চাই,—বলে গলা সাফ করে নিয়ে শেষ করলাম, সে আমার ভাবী বধূ বলে।

তবুও কিন্তু গলাটা সাফ হল না—শেষের দিকে বুজে এল।

বিপ্লবকে নিয়ে জগন্নাথ দাস ফেরে ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যে। সঙ্গে একপাল পুলিশের লোক। ডেডবডি নিয়ে তারা ব্যস্ত রইল ওপরের ঘরে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট সারা বাড়ি তোলপাড় করে ফেলল আঙুলের ছাপের অন্বেষণে। ফোটোগ্রাফার কত ফটো যে তুলল, তার ইয়ত্তা নেই।

জগন্নাথ দাস আর বিপ্লব একতলার ঘরে বসে জেরায় জেরায় কাহিল করে তুলল সুরমাকে। মালিনী পোদ্দারকে সে স্বচক্ষে দেখেছে পিসিমাকে মেঝেয় ফেলে বুকে বসে গলা টিপে ধরে থাকতে। না, তার কোন সন্দেহই নেই এই ব্যাপারে। চোখের ভুল ? অসম্ভব! ডাক্তার বাসুদেব সাহার কাছে ফটোগ্রাফ দেখেছে মালিনী পোদ্দারের —তারও আগে দেখেছে ডাক্তার বাসুদেব সাহার ঘর থেকে তাকে বেরিয়ে যেতে। কাজেই ভুল তার হয় নি—হতে পারে না। মালিনীই খুন করে গেছে তার পিসিমাকে। কেননা, পিসিমা তাকে ডাইনী, বেশ্যা এবং কুলটা বলে গালাগাল দিয়েছিল—স্বকর্ণে শুনেছে সুরমা। শুনেই তো ওপরে দৌড়ে গিয়েছিল সে। গিয়েও বাঁচাতে পারে নি পিসিমাকে, পাকড়াও করতে পারে নি মালিনী পোদ্দারকে, হরিণীর মত তিন লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে, পেছনের দরজা দিয়ে উধাও হয়েছে সে। দরজা খোলাই ছিল—গোবিন্দ খোলা দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় নিজের হাতে। বন্ধ দরজা দেখেছেন বাসুদেব সাহা। পিসিমার সঙ্গে সুরমার সম্পর্ক কিরকম ছিল ? অম্লমধুর। কেননা পিসিমা বড্ড বেশি শাশুড়িগিরি ফলাতেন সুরমার ওপর। সেকালের মানুষ তো, একালের মেয়েদের বেহায়াপনা দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। গোবিন্দ তাড়াতাড়ি রেজেস্ট্রী করে বিয়ে না করলে কখনোই সুরমাকে তিনি বিয়ে করতে দিতেন না। তাই বলে গোবিন্দকে

তিনি তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতেও চান নি। অগাধ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশনকে—দুই তৃতীয়াংশ গোবিন্দকে। রাত ন'টায় এই সব কথা বলবার জন্যেই বোধ হয় তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন ভাইপো আর ধিঙ্গি বউকে। সেই সঙ্গে সুরমাকে অন্তর টিপুনি দিয়ে কিছু জ্ঞানও দিতেন।

সংক্ষেপে, এই হল সুরমার জবানবন্দী। ঘণ্টাখানেক জেরার সারবস্তু। বিপ্লব সব শুনে বলেছিল—পিসিমার মৃত্যুতে কার লাভ বেশি? গোবিন্দ মুখ কালো করে বলেছিল—আমার। জানি আমাকেই বেশি সন্দেহ করা হচ্ছে। কিন্তু আমি খুন করতে যাব কেন? সম্পত্তি তো আমি পাচ্ছিই। উইলও পাল্টান নি। তাছাড়া, উনি যখন খুন হন, আমি তখন যে ডীলারের সঙ্গে গল্প করছিলাম, তাকে আপনাদের সামনে হাজির করব'খন কাল সকালে।

বিপ্লব তখন বলেছিল, ছি-ছি, এসব কি বলছেন? আপনাকে আমি সন্দেহ করতে যাব কেন? আমি জানতে চাইছিলাম, পিসিমাকে গলা টিপে মেরে লাভটা কার বেশি?

গোবিন্দ এবার শক্ত গলাতেই বলল, বলছি তো আমার। কিন্তু পিসিমা মরার আগে কুলটা, বেশ্যা, ডাইনী বলে যাকে গালাগাল দিচ্ছিলেন, সে নিশ্চয় আমি নই।

বিপ্লব আর এক প্রস্থ 'ছি-ছি' করে বলেছিল, বারবার আপনি সেই একই ভুল করছেন গোবিন্দবাবু। লাভ বলতে সব সময়ে যে টাকাকড়ির লাভ হয়, তা তো নয়। অনেকরকম ভাবেই একজন মানুষ লাভবান হতে পারে আর একজনের মৃত্যুতে। মালিনী পোদ্দারের কোন লাভ আছে কি পিসিমাকে খুন করে?

সেটা বার করাই তো আপনাদের কাজ!—চিবিয়ে চিবিয়ে বলছিল গোবিন্দ।

এবং সেটা আমরা বার করব, নিশ্চিন্ত থাকুন।—এবার একটু দৃঢ় কণ্ঠেই বলেছিল বিপ্লব, কিন্তু সমস্যাটা কোথায়?

কোথায় ?

মালিনী পোদ্দার যে ধোয়া তুলসী পাতা নয়, সে খবর আমরা রাখি। কিন্তু এই কেসে তাকে আমরা জড়াতে পারছি না। কারণ, আপনার পিসিমা যে সময়ে খুন হয়ে গেলেন, ঠিক সেই সময়ে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে ছিলেন ইনি—। বলে জগন্নাথ দাসকে দেখালো বিপ্লব।

পান চিবুতে চিবুতে জগন্নাথ বললে নির্লিপ্ত স্বরে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি অন্তত এই কেসে মালিনী পোদ্দারের স্বপক্ষে সাক্ষী দেবো কোর্টে। উনি নির্দোষ। খুন উনি করেন নি—করেছে অন্য কেউ।

গোবিন্দর স্নায়ু আর সহ্য করতে পারল না। রেগে গিয়ে বললে, ঘুরে ফিরে সেই আমাকেই সন্দেহ করা হচ্ছে।

মুঠোর ওপর চিবুক রেখে বিপ্লব বললে ঠাণ্ডা গলায়, রেগে গেলে যুক্তি হারিয়ে ফেলবেন, গোবিন্দবাবু। আমরা প্রথম পর্যায়ে সবাইকেই সন্দেহ করব—আপনার স্ত্রীকেও। দ্বিতীয় পর্যায়ে তদন্ত ফলের ভিত্তিতে একে-একে নির্দোষীদের বাদ দেব। তৃতীয় পর্যায়ে প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করব। আপনারা স্বামী-স্ত্রী এখন প্রথম পর্যায়ে। তাই বলছিলাম, রাগ করবেন না। আমাদের সন্দেহকে খুঁচিয়ে শক্ত করে দেবেন না।

আমি গলা খাঁকারি দিলাম। বিপ্লব বললে, কিছু বলবি, বাসুদেব ?

হ্যাঁ। প্রথম পর্যায়ের সন্দেহভাজনদের ফর্দ থেকে তাহলে মালিনী বাদ গেল তো ?

সতর্ক দৃষ্টি হেনে বিপ্লব বললে, হ্যাঁ।

তাহলে আমি তার সঙ্গে মেলামেশা চালিয়ে যেতে পারি তো ? পেছনে টিকটিকি ঘুরবে না ?

ঘুরবে।—ফোঁস করে উঠল রোগা বেঁটে বিপ্লব। মাথার সব চুল উঠে গেছে বলেই বিরলকেশ মস্তকে হাত বলানো ওর ব্যায়রামে

দাঁড়িয়ে গেছে। মস্তক এবং শীর্ণ দীর্ঘ নাসিকার অগ্রভাগ কণ্ডূয়ন করে নিয়ে বললে ছোটলোকি গলায়, আর লোক হাসাস নি বাসু। টি-টি পড়ে যাবে সমাজে। এই খুনে মালিনী জড়িত না থাকতে পারে—শুধু যে অন্তস্থিতিই জোরদার, তা নয়—মালিনী পোদ্দারের সঙ্গে পিসিমার আগেভাগে কোন যোগাযোগই যে ছিল না, সে খবরও আমাদের কাছে আছে। তাকে চোখে চোখে রাখা হয়েছিল এই কারণেই, যাতে আবার কাউকে ব্ল্যাকমেল করতে না পারে।

মালিনী পোদ্দার ব্ল্যাকমেল করে নাকি? তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুরমা।

করে বৈকি। বোম্বাইয়ের ফিল্মওয়ার্ল্ডে মালিনী পোদ্দারের বছর পাঁচেক আগেও বিলক্ষণ নাম-ডাক ছিল নর্তকী এবং এক্সট্রা অ্যাকট্রেস হিসেবে। গোয়াতে প্রথম ভাব হয় মুকুন্দ গোয়েঙ্কার সঙ্গে। ব্যাচেলর মুকুন্দ ঘরণীর সম্মান দিতে চেয়েছিল মালিনীকে। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক সেই সময়ে মালিনী তাকে দোহন করতে শুরু করে নিজেরই কয়েকটা ফটো তার কাছে পাঠিয়ে। ফটোগুলো সে নাকি পাঠিয়ে দেবে মুকুন্দর আত্মীয়স্বজনের কাছে। অবশ্য এক লাখ টাকা পেলে সে ছেড়ে দেবে মুকুন্দকে। নইলে আত্মীয়স্বজনের কাছে মাথা হেঁট করে ছাড়বে মুকুন্দর।

কিসের ফটো? সুরমা উদগ্রীব। আমিও।

ব্লু ফিল্মের।—আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল বিপ্লব। নোংরা ফিল্মে চূড়ান্ত নোংরামির অভিনয়। কদর্য এবং ভয়াবহ। সে সব ছবির বিষয়বস্তুর বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়—দেখলেও পাপ। মালিনীর সেই ছবি দেখে মুকুন্দ এক লাখ টাকা দেয় মালিনীকে। কিন্তু মালিনী আজও তাকে ছাড়ে নি—খেপে খেপে টাকা আদায় করে যাচ্ছে। মুকুন্দ একটা ভুল করেছিল। গোয়ার সী বীচে মালিনীর সঙ্গে অনেকগুলো ফটো তুলে ফেলেছিল। আমার বন্ধু ডাক্তার বাসুদেব সাহা সেই একই ভুল করে ফেলেছে পুরীর সমুদ্রতীরেও—

নাম-ডাক আছে কলকাতায়—ব্ল্যাকমেলিং আরম্ভ হল বলে। কাজেই মালিনী পোদ্দারকে আমরা ছাড়ছি না।

আমি বললাম, সাধু, সাধু, সাধু। হে সমাজসেবী বিপ্লব, একটা প্রশ্ন তাহলে করা যাক। খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

হোক, প্রশ্ন হোক।

মুকুন্দ গোয়েঙ্কা নামক গাড়লটি কি মালিনীর হাতে টাকা দিয়েছিল?

না। মালিনীর লোক এসে নিয়ে গেছে।

ফার্স্ট ক্লাশ। মালিনীর ব্লু-ফিল্ম ফটোগ্রাফ কি মালিনী নিজের হাতে দিয়েছিল মুকুন্দ গোয়েঙ্কাকে?

না, পোস্টে এসেছিল।

আরো ফার্স্ট ক্লাশ। কোন প্রমাণ আছে কি যে মালিনীর হাতে মুকুন্দ গোয়েঙ্কার টাকা পৌঁছেছে?

না, মানে—

ব্যস, আর কোন কথা নয়। মালিনীকে তাহলে কি ব্ল্যাকমেলার বলা যায়?

টেকনিক্যালি বলা যায় না। কিন্তু ফটোগুলো তো—

আর কোন কিন্তু নয়। ফটো যাই থাক না কেন, মালিনী নিজে যখন টাকা নেয় নি, তখন সে ব্ল্যাকমেলার নয়। একজন ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে মিথ্যে অপবাদ দেওয়াটা পুলিশী রুচিতে সম্ভব—ভদ্রসমাজে অন্যায়। আমি কিন্তু লিগ্যাল স্টেপ নেব, কারণ মালিনী আমার ভাবী বউ।

ননসেন্স।—রেগে গেল বিপ্লব, মালিনীর আগের স্বামী প্রাণকৃষ্ণ পোদ্দার সুইসাইড করল কেন জানিস?

শুনতে আপত্তি নেই।

একই রকম ব্লু-ফিল্ম ফোটোগ্রাফ প্রাণকৃষ্ণ পোদ্দারের কাছেও পৌঁছেছিল। ভদ্রলোক ফিল্মের মেয়ের জৌলুষে ভুলেছিলেন।

বিয়ের পর পর সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিশও করেছিলেন মালিনীকে। তারপরেই এসে পৌঁছলো ফটো আর লাখ টাকার দাবী।

কে পাঠালো ? মালিনী ?

আমতা আমতা করে বিপ্লব বললে, সেরকম প্রমাণ আমরা এখনও পাই নি। আমরা রিকন্সট্রাক্ট করে যা খাড়া করেছি, তা এই : মালিনীর কৌশলই হল কাউকে দিয়ে ফটো আর ব্ল্যাক-মেলিংয়ের চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া। তারপর—

আমি বললাম, এবার আমি ননসেন্স বলব। কোন সেন্স নেই তোর কথার মধ্যে। যে মেয়ে স্বামীর সম্পত্তি পাবেই, সে কখনো নিজের কলঙ্কিত অতীতের ছবি স্বামীকে পাঠিয়ে তার মন ভেঙে দেয় ? টাকা চেয়ে সোনার হাঁসকে মারতে চায় ? ননসেন্স ! ননসেন্স ! ননসেন্স !

মরিয়া হয়ে বিপ্লব বললে, নো, নো, দেয়ার ইজ সেন্স ইন ইট। মালিনীর মোডাস অপারেনডি সরল অথচ বুঝতে না পারার জন্যে জটিল মনে হয়। সে স্বামীকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছিল যাতে পুরো সম্পত্তিটা হাতে পেলে ফুর্তি করতে পারে সারা জীবন।

ননসেন্স ! মেয়েরা ঘর বাঁধতে চায়—ভাঙতে চায় না। তাছাড়া, তার মধ্যে যে সন্ন্যাসিনীর পবিত্রতা আর বৈরাগ্য লক্ষ্য করেছি, তাকে ফুর্তি করা বলা যায় না। অন্তর্দৃষ্টি তোর কবে জাগবে বিপ্লব ?

টেবিলে দমাস করে ঘুসি মেরে আর নাকের ডগা আর মাথায় টাক চুলকোতে চুলকোতে চিলের মত চেঁচিয়ে বিপ্লব বললে, তুই মরেছিস, বাসু, তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে।

পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করে টকাস টকাস করে ডালার ওপর টোকা মারতে মারতে বললাম, নস্যি নেওয়াটা প্র্যাকটিশ কর, বিপ্লব। ব্রেন খুলে যাবে। তোর কথা থেকেই আমি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছি, তা এই : কোন এক ব্যক্তি মালিনীর ব্লু-ফিল্ম ছবি

পাঠিয়ে মুকুন্দ গোয়েঙ্কাকে ব্ল্যাকমেল করেছে এবং এখনও করছে, প্রাণকৃষ্ণ পোদ্দারকে সেই একই পন্থায় দোহন করতে গিয়ে তাকে আত্মহননের পথে ঠেলে দিয়েছে, সম্ভবত পিসিমাকেও ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল বলে উনি আজ গোবিন্দ আর সুরমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন পরামর্শ করার জন্যে। পিসিমার সম্পত্তির ওয়ারিশ গোবিন্দ। মিস্টিরিয়াস এই ব্ল্যাকমেলারের মোডাস অপারেনডি হল কোন পুরুষের নামে কলঙ্ক লেপন করার হুমকি—এ ক্ষেত্রে পুরুষ গোবিন্দ স্বয়ং। তার নামে কুৎসা রটনার ভয় দেখালেই মুখবন্ধ করার জন্যে পিসিমা এনি অ্যামাউন্ট দিতে চাইবেন।

ননসেন্স!—তেড়ে উঠল বিপ্লব, গাল্পগল্প অনুমান সিদ্ধান্ত ফিকশানে মানায়—বাস্তবে নয়। যে ব্ল্যাকমেকার মুকুন্দ আর প্রাণকৃষ্ণকে ভয় দেখিয়েছে, সেই একই ব্ল্যাকমেলার পিসিমাকে ভয় দেখাতে আসবে, এই উদ্ভট কল্পনা মাথায় আসছে কি করে?

আসছে সুরমার জবানবন্দী শোনবার পর।—গম্ভীর গলায় বললাম আমি, সে দেখেছে মালিনীকে পিসিমার গলা টিপে ধরে থাকতে। মিথ্যে সে নিশ্চয় বলছে না। অথচ জগন্নাথ দাস ঠিক সেই সময়ে মালিনীর সঙ্গে ছিল অন্যত্র। তাহলে কাকে দেখেছে সুরমা?

মালিনী পোদ্দারের ছায়াকে।—ব্যঙ্গের সুরে বললে বিপ্লব।

রাইট ইউ আর, আমিও তাই বলতে চেয়েছিলাম। সুরমা দেখেছে এমন একজনকে যে মালিনীর ছায়ার সামিল। অর্থাৎ নকল মালিনী বলেই তাকে মনে হতে পারে। হয় সে মালিনীর যমজ বোন অথবা মালিনীর মত দেখতে অন্য কোন মেয়েছেলে।

ঘর নিস্তব্ধ। গোবিন্দ, সুরমা, জগন্নাথ, বিপ্লব—প্রত্যেকের মুখের দিকে একে একে চাইলাম। প্রত্যেকেরই চোয়াল ঝুলে পড়েছে, চোখ গোল-গোল হয়ে গেছে।

আমি উঠতে উঠতে বললাম, এই অনুমান সিদ্ধান্ত থেকেই ব্লু-

ফিল্ম ফটোর মিস্ত্রীও সলভ করা যায়। ফটোগুলো আদৌ মালিনীর নয়—ভ্রষ্টা সেই মেয়েছেলেটির। ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে হয়কে নয়, নয়কে হয় করা যায়—ক্যামেরা ট্রিকসের এই যাতু দিয়ে মালিনীর মতই দেখতে একটি মেয়েকে মালিনী বলে চালিয়ে দেওয়া কি খুব কঠিন কাজ ? বিশেষ করে বোম্বাইতে। যেখানে জাঁদরেল ক্যামেরা-ম্যান ট্রিক-শটয়ের ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াচ্ছে দেশময় ? সুতরাং আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই—মালিনী আধোয়া তুলসীপাতা—ওর মধ্যে কোন মালিন্য নেই—যা কিছু আছে তা তার মধ্যে, আর এই লোকটার মধ্যে।—বলে তর্জনি সঙ্কেতে দেখালাম জগন্নাথ জীবটিকে।

সাততাড়াতাড়ি বললে বিপ্লব, যাচ্ছিস কোথায় ?

মালিনীর কাছে। তার মুখেই শুনতে চাই এরকম কোন মেয়ে-ছেলের সন্ধান সে রাখে কিনা।

লাফিয়ে উঠে বিপ্লব বললে, দাঁড়া, দাঁড়া, আমিও যাব তোর সঙ্গে।

কিন্তু মালিনীকে তার ভগ্ন ইষ্টকালয়ে পাওয়া গেল না। ঘরে তালা ঝুলছে। রাত তখন এগারোটা। এত রাত পর্যন্ত সে কোথায় থাকতে পারে, তা নিয়ে গবেষণা করে বিপ্লবের কাছ থেকে একটুকরো কাগজ চেয়ে নিয়ে টর্চের আলোয় লিখলাম :

মালিনী,

তোমার নামে সমস্ত মিথ্যে কলঙ্ক আমি মুছে দেব। শুধু একটা খবর তোমার মুখেই শুনতে চাই। তোমার মত দেখতে অন্য কোন একটি মেয়েকে তুমি চেনো ? কাল সকালে ছটায় আসব। বাড়িতে থেকো। ভয় নেই—আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই। পৃথিবীর কোন শক্তি তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কাল সকাল ঠিক ছটায়। ইতি—

তোমার ভাবী স্বামী

বাসুদেব

চিঠিখানা দরজার কজায় রুমাল দিয়ে বেঁধে রেখে চলে এলাম বাড়িতে।

পরদিন ভোর সাড়ে পাঁচটায় বিপ্লব এল আমার বাড়িতে। দুজনে গেলাম মালিনীর বাড়িতে। দরজা ভেজানো রয়েছে। খাটের ওপর ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে মালিনী। সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজে মোড়া যেন একটি দেবীমূর্তি।

আমাদের পায়ের শব্দ এবং গলা খাঁকারিতেও মালিনী পাশ ফিরে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল না। টেবিলের ওপর তালা চাপা একটা চিঠি দেখলাম।

প্রিয়—

তুমি যাকে চেয়েছিলে. তাকে এবার পাবে। সে আমার বোন, মোহিনী। আমার জীবন বিষময় করে তুলেছিল মোহিনী। আমার সুখ সে দেখতে পারে নি। ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে মরেছে, নিজের কুকীর্তির ছবি পাঠিয়ে আমার একটা বিয়ে হওয়া ভেঙেছে, আর একটা বিয়ের পর স্বামীকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে। এখানেও সে আমার পেছন পেছন এসেছে! সে আমার জীবনের দুষ্টগ্রহ। আমি একা থাকতে চাই এই কারণেই—কারও জীবনে অভিশাপ হয়ে ঢুকতে চাই না। আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমাকে ভুলে যেও। আজ যা ঘটে গেল, এরপর আমার বেঁচে থাকবার ইচ্ছেও আর নেই। আমি আর পারছি না সহ্য করতে—আর পারছি না। চললাম। ইতি—

তোমার

মালিনী

চিঠিখানা আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলাম। বিপ্লব একদৃষ্টে চেয়ে আছে ঘুমন্ত মালিনীর পিঠের দিকে। আমিও তাকালাম সেদিকে। রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে এলোখোঁপার তলায়।

খাট ঘুরে গিয়ে দাঁড়ালাম মালিনীর সামনে।

না, মালিনী নয়। তারই মত কোঁকড়া চুল, শ্যামল কান্তি—কিন্তু সে মালিনী নয়। মোহিনী। যমজ বোন।

মোহিনীর কপালে এতটা বুলেটের ফুটো। রক্ত জমে গেছে চারপাশে।

বিপ্লব যখন হেঁট হয়ে দেখছে মোহিনীকে, আমি তখন ঘরের জিনিসপত্র দেখে নিলাম। মালিনীর স্যুটকেশ যেমন তেমনি পড়ে রয়েছে। মানিব্যাগ পর্যন্ত রেখে গেছে। দড়িতে সাদা শাড়ি আর ব্লাউজ ঝুলছে। পায়ের জুতো টেবিলের তলায় রয়েছে। স্যুটকেশ না নিয়ে খালি পায়ে মালিনী চলে গেছে। কোথায়? কোথায় যেতে পারে সে নগ্ন পদে? মানিব্যাগ সঙ্গে না নিয়ে স্যুটকেশ ফেলে রেখে সমুদ্র সৈকতে তার যাবার পথ কোন দিকে?

উদভ্রান্তের মত বেরিয়ে এলাম বাইরে। বালির ওপর অনেক পায়ের দাগ। কিছু দূরেই সমুদ্র। রাত্রে জোয়ারের জল সরে গেছে। ভিজে মসৃণ বালুকাতটে অজস্র গর্ত দিয়ে কাঁকড়ার দল উঁকি মেরে যেন সকৌতুকে লক্ষ্য করছে আমাকে। জলে ভেসে আসা ঝিনুক পড়ে আছে বিস্তর।

মোলায়েম পেলব বালুকাতটের ওপর দিয়ে শুধু একজোড়া পায়ের ছাপ জলের দিকে এগিয়ে গেছে। ছোট পদচিহ্ন—জলের মধ্যে নেমে গেছে, আর উঠে আসে নি।

কিছু দূরে একটা ভেজা রুমাল। আমার। রুমাল অল্পস্বল্প জল এসে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে—নিয়ে যেতে পারছে না!

নিশ্চুপ দেহে দাঁড়িয়ে রইলাম। জোরালো হাওয়া মিতালী পাতিয়ে গেল আমার দু'চোখের দু' বিন্দু লোনা অশ্রুর সঙ্গে।

আমার প্রথম ভালোবাসা হারিয়ে গেল জলের মধ্যে। পেছন থেকে কাঁধে হাত রাখল বিপ্লব। বলল গাঢ় কণ্ঠে, বান্টু, আমাকে ক্ষমা কর।

করলাম।

দ্বিতীয় পর্ব

খুন করে আত্মঘাতী হয়েছে মালিনী পোদ্দার—এই মর্মে পরের দিনই দৈনিকে খবর বেরিয়েছিল, চোখে পড়ে থাকবে আপনাদের। মোহিনী খুন করেছে গোবিন্দর পিসিমাকে, মোহিনীকে খুন করে সমুদ্রে নেমে গেছে মালিনী। ব্যস, মিটে গেল। কেস চাপা পড়ে গেল।

পুলিশ অবশ্য পুরীর একটি বিখ্যাত হোটেলের সিঙ্গলরুমে মোহিনীর পরিত্যক্ত জিনিসপত্র খুঁজে পেয়েছিল। পাওয়া গিয়েছিল ব্লু-ফিল্ম নেগেটিভ এবং প্রিন্ট, ব্ল্যাকমেলিংয়ের চিঠিপত্র। মুকুন্দ গোয়েঙ্কাকে লেখা চিঠির খসড়া এবং একটি ডায়েরী। ডায়েরী না বলে একটা খাতাই বলা উচিত। খাপছাড়া ভাবে লেখা দিনপঞ্জী। যখন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেছে মোহিনীর জীবনে, তখন কিছু লিখেছে। তাই সেই লেখায় জীবনের ব্যথা আছে, হাসি আছে, উল্লাস আছে, আবার বিষাদও আছে। আছে জীবনের প্রতি পদে প্রবঞ্চিত হওয়ার করুণ ইতিহাস। মালিনীর মত সে ভালভাবেই বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে অন্য পথে টেনে নামানো হয়েছিল। সে যখন হেরে যাচ্ছে নিজের অবিমৃষ্যকারীতার পরিণামে, তখন জিতে বেরিয়ে যাচ্ছে মালিনী। ঈর্ষা-বিষে আচ্ছন্ন হয়ে মালিনীকেও টেনে এনে দাঁড় করাতে চেয়েছিল তার পাশে—হেরে যাওয়া জায়গাটিতে।

তাই ব্ল্যাকমেলিংয়ের চিঠি, ব্লু-ফিল্মের ফটো। সাল তারিখ পাওয়া গেল ডায়েরী থেকেই—কবে কি চিঠি পাঠানো হয়েছে কাকে, পাওয়া গেছে কত টাকা এবং কিভাবে তিল তিল করে গড়ে তোলা মালিনীর সুখের প্রাসাদ ধূলিস্মাৎ হয়ে গেছে চক্ষের নিমেষে—তারই ইতিহাস। দুঃখ পেয়েছে কি মোহিনী? না। একদম না। দু-বোন একই সময়ে এসেছিল জগতে—যমজ যে। একই ভাবে তাদের

জীবন কাটুক—মোহিনী শুধু তাই চেয়েছিল? কিন্তু মালিনীর অত সতীপনা তার ভাল লাগে নি। তাই মালিনীকে ছায়ার মত অনুসরণ করবে সে—লোকে ভুল করবে, মোহিনীকে মালিনী ভেবে নেবে, মোহিনীর সমস্ত অপকর্মের জন্যে মালিনীকে শাস্তি দেওয়া যাবে। মোহিনীর জীবনে ঘর-বর নেই, মালিনীর জীবনেও ঘর-বর থাকবে না—এই হল মোহিনীর পণ। তার মোটিভ।

পুলিশ খাতাখানা পেয়ে উপকৃত হল। মালিনীকে ছায়ার মত ফলো করে এতদিন তারা যে পণ্ডশ্রম এবং পাপ করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে মালিনীকে কিন্তু পাওয়া গেল না।

পাওয়া গেল না রিভলবারটিকেও—যার গুলি দিয়ে বোনের কয়েটি ছিদ্র করেছে মালিনী।

মোহিনী গোবিন্দর পিসিমার কাছে কেন গিয়েছিল, এ রহস্য কিন্তু রহস্যই থেকে গেল। খাপছাড়া ভাবে লেখা খাতায় এ ব্যাপারটা লেখবার সুযোগ পায় নি মোহিনী—ক্লাইম্যাক্স আসার পরেই তো খুন হয়ে গেল নিজেই। তাই আফশোষ রয়ে গেল পুলিশ মহলের। কি এমন ঘটেছিল যে পিসিমা অমন চিলের মত চেঁচিয়ে মোহিনীকে কুলটা, ডাইনী এবং বেশ্যা বলবেন?

যাই হোক, সব রহস্যের তো সুচারু সমাধান হয় না। পুলিশের দপ্তরে অমন কত আনসল্‌ভড মিস্ট্রীই তো ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে থাকে। তাই ডবল খুনের জোড়াতালা সমাধান করে পুলিশ নিশ্চিন্ত হল।

কিন্তু ডবল লোকসান হয়ে গেল গোবিন্দর আর সুরমার। পিসিমা তো গেলেনই, সেই সঙ্গে অদৃশ্য হলেন কর্নেল ম্যালকট।

পাঠক-পাঠিকার নিশ্চয় মনে আছে, সুরমা যখন টেলিফোনে 'খুন! খুন!' বলে চেঁচিয়ে খবর দিচ্ছিল আমাকে, ঠিক তখনি উনি যেন ছুটে পালিয়ে গেছিলেন বসবার ঘর থেকে।

তার পর থেকে কর্নেল ম্যালকটকে আর কেউ দেখে নি।

এর কিছুদিন পরেই আমিও নিরুদ্দেশ হলাম।

কলকাতা ফিরে এসে কিছুদিন চেম্বার খুলে বসেছিলাম। কিন্তু মন তখন এত রিক্ত যে কোন ব্যাপারে মন লাগাতে পারছিলাম না। এরকম মানসিক দৈন্যদশা আমার কখনো হয় নি। একটি নারীর অভাবে পুরুষের অন্তর যে এরকম শূন্য হয়ে যায়, এ অভিজ্ঞতা আমার জীবনে সেই প্রথম। মনের ভেতরটা সদাই মোচড় দিতে থাকে অব্যক্ত বেদনায়। অব্যক্ত, সত্যই অব্যক্ত। বলে কাউকে বোঝানো যায় না কি কষ্ট মনের মধ্যে। মন হু-হু করা কাকে বলে, তা সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে উপলব্ধি করলাম। ভালোবাসা কি বস্তু, তা ভালোভাবেই টের পেলাম।

এই মন নিয়ে মনের রুগীর চিকিৎসা করা চলে না। তাই অনেকদিন ধরেই মনের মধ্যে যে অসম্ভব অভিযানের বাসনাটা সুপ্ত ছিল, এবার তাই নিয়েই মাতব ঠিক করলাম। হিমালয় আজও দুর্গম, দুর্জ্ঞেয়। দেশ-বিদেশের দুঃসাহসীরা হিমালয়ের একটির পর একটি শিখর জয় করে চলেছে এমন একটা অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় হিসেবী বুদ্ধি দিয়ে যার কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, প্রাণ বিপন্ন করে পাহাড়ে উঠে শিখর জয় করে কোন লাভ আছে কি?

আছে বৈকি। দুর্গমের সঙ্গে সংগ্রামের আনন্দ। মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য বানিয়ে চিত্তকে নির্ভর করার আনন্দ। আমিও ঠিক করলাম, এই দুর্গম পথেরই পথিক হব। একা। তুষার ঢাকা হিমালয়ের কোলে কিছুদিন একা একা ঘুরে মনটাকে সমৃদ্ধতর করে আবার বসব প্র্যাকটিশে।

সুরমা আমার সঙ্কল্প শুনে চমকে উঠে বলছিল, বাসুদা, আমরাও যাব আপনার সঙ্গে।

আমি রাজী হই নি। হেসে বলেছিলাম, পথি নারী বিবর্জিতা।

যেভাবে আমি টো টো করে বেড়াব, তা তোমরা সহ্য করতে পারবে না।

সন্ন্যেসী হয়ে যাচ্ছেন নাকি? চোখ বড় বড় করে বলেছিল সুরমা, হিমালয়ে গিয়েই তো সবাই সাধু হয়ে ফেরে?

অনেকে ফেরেও না।—বলেছিলাম আমি, কিন্তু আমি ফিরব। সাধু-টাধু হওয়ার বান্দা আমি নই। সমুদ্রের ধারে গেছিলাম নির্জনে কিছুদিন কাটাবো বলে—ঠিক তার উল্টোটা ঘটেছে। তাই এবার যাব এমন এক জায়গায় যেখানে ভ্রমণ-বাতিকগ্রস্তরা হুট করে যেতে পারে না।

ট্রেকিং করবেন? বলেছিল গোবিন্দ।

হ্যাঁ।

আসল অভিপ্রায়টা বলি নি অবশ্য। কলকাতা থেকে বেরোতে চাই লম্বা ছুটি নিয়ে কয়েকটা রহস্যের মীমাংসা করার জন্যে।

প্রথমে গেলাম দিল্লীতে। দিন কয়েক সেখানে কাটিয়ে পৌঁছলাম কাঠমাণ্ডুতে।

সেদিন ছিল তেসরা মার্চ।

বাতাস বেশ পরিষ্কার। বুক ভরে শ্বাস নিলে সমস্ত শরীর যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে!

আট টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নিলাম। বড় হোটেলে উঠব না ঠিক করেছিলাম, হিপিরা যে কৃচ্ছ্রসাধন করে, আমিও করব সেই রকম।

উদ্দেশ্য আরও একটা ছিল। যথাসময়ে তা স্পষ্ট হবে।

চাইনীজ খাবার খেলাম এক প্লেট। ছ' টাকায় এমন তরিবৎ করে খাওয়া কলকাতায় বসে ভাবতেই পারা যায় না। খেয়েদেয়ে বেরোলাম কাঠমাণ্ডু দর্শনে। মার্কোপোলোর আমলের সাজানো শহর যেন। সুপ্রাচীন সভ্যতার ছাপ এ শহরের সব জায়গায়।

চোখ জুড়োনো দৃশ্য, কান জুড়োনো শব্দ আর মন ভোলানো সুগন্ধির অপূর্ব সমাহার। হিন্দু মন্দির আর বৌদ্ধ প্যাগোডায় ছাওয়া শহর। পিলুটি করা কাঠ আর পাথরের কত দেবদেবীর মূর্তি যে দেখলাম, তার ঠিক নেই। মন্দির আর প্যাগোডার বিরামবিহীন টং টং ঢং ঢং ঘণ্টার আওয়াজ, পথেঘাটে মশলা দিয়ে রান্না করা রকমারি আহারের সুগন্ধ, ঠিক মাঝখানে বিরাট মার্কেট স্কোয়ার। দৈবপ্রসাদ ধন্য ষাঁড় আর গরু নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে সরু সরু পথগুলোয়। পবিত্র চতুষ্পদ বলেই তাদের খাতিরের অন্ত নেই। মানুষ এত পূজা পায় না, যত পায় এরা। তিব্বতী লামাও ষাঁড় আর গরুদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে পথঘাট। সেই সঙ্গে আছে হিন্দু সন্ন্যাসী, ফুলওয়ালা আর কাঠওয়ালা—মাথায় ফিতে দিয়ে বাঁধা বিরাট কাঠের বোঝা নিয়ে হাঁটছে অক্লেশে।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে হাসিস আর মারি-হুয়ানা সেবনে আইনের চোখরাঙানি ছিল না নেপালে। যত পারো খেয়ে যাও—কেউ বাধা দেবে না। হিপিদের এত ভিড়ের অন্যতম কারণ সেইটাই। 'হাশশপ'য়ে সে ভিড় ইউরোপীয়ান আর নর্থ আমেরিকান ছোঁড়াছুঁড়িদের। তিব্বতী উদ্বাস্তু পরিচালিত ডজন-খানেক ছোট রেস্টুরেন্ট এদের আড্ডাখানা। পাশ্চাত্যের ইউথট্রেড কন্ট্রোল করছে এই ক'টি তিব্বতী রেস্টুরেন্ট। ওয়ার্ল্ডের বেস্ট অ্যাপ্ল কেনার ইচ্ছে হলে চলে আসুন কাঠমাণ্ডুতে। সেই সঙ্গে শুনবেন সিমন আর গারফানকেলের স্টিরিও বাজনার সঙ্গে হিন্দু পূজারীদের একঘেয়ে স্তোত্রপাঠ।

আমার চোখ ঘুরছে কিন্তু পথেঘাটে। হাশশপে চোখ বুলিয়ে নিয়েছি—গলি খুঁজতে, মার্কেট স্কোয়ারেও নজর রেখেছি। সস্তা হোটেলের আড্ডাখানাগুলোতেও বসে থেকেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। চিন্তাভাবনা এনার্জি যদিও হিমালয়ের দিকে—যার টানে এসেছি নেপালে।

যেভাবে আমি টো টো করে বেড়াব, তা তোমরা সহ্য করতে পারবে না।

সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছেন নাকি? চোখ বড় বড় করে বলেছিল সুরমা, হিমালয়ে গিয়েই তো সবাই সাধু হয়ে ফেরে?

অনেকে ফেরেও না।—বলেছিলাম আমি, কিন্তু আমি ফিরব। সাধু-টাধু হওয়ার বান্দা আমি নই। সমুদ্রের ধারে গেছিলাম নির্জনে কিছুদিন কাটাবো বলে—ঠিক তার উল্টোটা ঘটেছে। তাই এবার যাব এমন এক জায়গায় যেখানে ভ্রমণ-বাতিকগ্রস্তরা হুট করে যেতে পারে না।

ট্রেকিং করবেন? বলেছিল গোবিন্দ।

হ্যাঁ।

আসল অভিপ্রায়টা বলি নি অবশ্য। কলকাতা থেকে বেরোতে চাই লম্বা ছুটি নিয়ে কয়েকটা রহস্যের মীমাংসা করার জন্যে।

প্রথমে গেলাম দিল্লীতে। দিন কয়েক সেখানে কাটিয়ে পৌঁছলাম কাঠমাণ্ডুতে।

সেদিন ছিল তেসরা মার্চ।

বাতাস বেশ পরিষ্কার। বুক ভরে শ্বাস নিলে সমস্ত শরীর যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

আট টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নিলাম। বড় হোটেলে উঠব না ঠিক করেছিলাম, হিপিরা যে কৃচ্ছ্রসাধন করে, আমিও করব সেই রকম।

উদ্দেশ্য আরও একটা ছিল। যথাসময়ে তা স্পষ্ট হবে।

চাইনীজ খাবার খেলাম এক প্লেট। ছ' টাকায় এমন তরিবৎ করে খাওয়া কলকাতায় বসে ভাবতেই পারা যায় না। খেয়েদেয়ে বেরোলাম কাঠমাণ্ডু দর্শনে। মার্কোপোলোর আমলের সাজানো শহর যেন। সুপ্রাচীন সভ্যতার ছাপ এ শহরের সব জায়গায়।

চোখ জুড়োনো দৃশ্য, কান জুড়োনো শব্দ আর মন ভোলানো সুগন্ধির অপূর্ব সমাহার। হিন্দু মন্দির আর বৌদ্ধ প্যাগোডায় ছাওয়া শহর। পিলুটি করা কাঠ আর পাথরের কত দেবদেবীর মূর্তি যে দেখলাম, তার ঠিক নেই। মন্দির আর প্যাগোডার বিরামবিহীন টং টং ঢং ঢং ঘণ্টার আওয়াজ, পথেঘাটে মশলা দিয়ে রান্না করা রকমারি আহারের সুগন্ধ, ঠিক মাঝখানে বিরাট মার্কেট স্কোয়ার। দৈবপ্রসাদ ধন্য ষাঁড় আর গরু নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে সরু সরু পথগুলোয়। পবিত্র চতুষ্পদ বলেই তাদের খাতিরের অন্ত নেই। মানুষ এত পূজা পায় না, যত পায় এরা। তিব্বতী লামাও ষাঁড় আর গরুদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে পথঘাট। সেই সঙ্গে আছে হিন্দু সন্ন্যাসী, ফুলওয়ালা আর কাঠওয়ালা—মাথায় ফিতে দিয়ে বাঁধা বিরাট কাঠের বোঝা নিয়ে হাঁটছে অক্লেশে।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে হাসিস আর মারিহুয়ানা সেবনে আইনের চোখরাঙানি ছিল না নেপালে। যত পারো খেয়ে যাও—কেউ বাধা দেবে না। হিপিদের এত ভিড়ের অন্যতম কারণ সেইটাই। 'হাশশপ'য়ে সে ভিড় ইউরোপীয়ান আর নর্থ আমেরিকান ছোঁড়াছুঁড়িদের। তিব্বতী উদ্বাস্তু পরিচালিত ডজনখানেক ছোট রেস্টুরেন্ট এদের আড্ডাখানা। পাশ্চাত্যের ইউথট্রেড কন্ট্রোল করছে এই ক'টি তিব্বতী রেস্টুরেন্ট। ওয়ার্ল্ডের বেস্ট অ্যাপ্ল কেনার ইচ্ছে হলে চলে আসুন কাঠমাণ্ডুতে। সেই সঙ্গে শুনবেন সিমন আর গারফানকেলের স্টিরিও বাজনার সঙ্গে হিন্দু পূজারীদের একঘেয়ে স্তোত্রপাঠ।

আমার চোখ ঘুরছে কিন্তু পথেঘাটে। হাশশপে চোখ বুলিয়ে নিয়েছি—গলি খুঁজতে, মার্কেট স্কোয়ারেও নজর রেখেছি। সস্তা হোটেলের আড্ডাখানাগুলোতেও বসে থেকেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। চিন্তাভাবনা এনার্জি যদিও হিমালয়ের দিকে—যার টানে এসেছি নেপালে।

তাই গেলাম দর্জি পিণ্ডা কামি শেরপার দোকানে। ওর ইচ্ছে সবাই ওকে পি-কে শেরপা নামে ডাকে। আমি ওর সে ইচ্ছে পূরণ করলাম এবং আমার ট্রেকিংয়ের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে কিনলাম ৩৬ মিটার লম্বা নাইলন দড়ি, বরফ স্ক্রু (দেখতে অনেকটা বিরাটকায় ছিপি খোলার কর্কস্ক্রুর মত), পাইটন (ধাতুর স্পাইক), ক্র্যামপন (বরফের গা বেয়ে ওঠার বুটের তলায় লাগানোর ইস্পাতের তৈরি আঁকশি থাবা) আর ক্যারাবাইনার (ধাতুর তৈরি স্ক্রু লাগানো বড় সাইজের ক্লিপ—যার মধ্যে দিয়ে দড়ি টানা বা ছাড়া যায় খুশি মত অল্প অল্প করে)। একটা পুরু লোমশ জ্যাকেট, লোমশ ট্রাউজার্স, ছুটো বরফ কুঠার আর একজোড়া গেটার (গোড়ালি ঢাকবার পুরু চামড়ার পটি) সমেত আমার মোট খরচ হল দু'হাজার টাকা। পরে এক ক্যানাডিয়ান তরুণের কাছে শুনেছিলাম, সে দেশে এই ক'টা জিনিসের দম হত পাঁচগুণ, অর্থাৎ দশ হাজার টাকা।

ঝিক্কি কালঘাম ছুটে গেল এভারেস্ট অঞ্চলের ম্যাপ যোগাড় করতে গিয়ে। খবর নিয়ে জানলাম, ও অঞ্চলের যে ক'টা ভাল ম্যাপ আছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে গেছে আমার আগে যারা রওনা হয়েছে।

কারা গেছে? একটু চেষ্টা করতেই পেয়ে গেলাম তাদের নাম।

মোট তেরোটা পর্বতারোহী অভিযান বেরিয়ে পড়েছে এভারেস্ট আরোহনের অ্যাডভেঞ্চারে। এদের মধ্যে রয়েছে এক পঞ্চাশোর্ধের অস্ট্রেলিয়ান সাহেব। সাহেব। চোখ তার নীল, মুখে মিষ্টি হাসি, দেহ শীর্ণ, কিন্তু এনার্জিতে ঠাসা। অস্ট্রেলিয়ান নীলচক্ষু প্রৌঢ়। এই রকমই এক সাহেবের সন্ধানে যে বেরিয়েছি আমি।

ম্যাপের এত আকাল দেখে ফের শরণাপন্ন হলাম পি কে'র। একটা ম্যাপ সংগ্রহ করা গেল নগদ দামে। তাতে মূল শিখরগুলো চিহ্নিত করা আছে বটে, কোন পথে যেতে হবে এবং রাস্তায় কি কি গ্রাম পড়বে তাও লেখা আছে—নেই শুধু পথের খুঁটিনাটি বিবরণ।

তলায় ছোট ছোট হরফে লেখা বুক দমানো সতর্কবাণী—ব্রীজ আর নদী পেরোনোর সাঁকো বিনা বিজ্ঞপ্তিতে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

চমৎকার! অতীব চমৎকার! তারপর ভাবলাম এই না হলে অ্যাডভেঞ্চার। পথের কষ্ট মাথায় তুলে নেবো বলেই তো এসেছি। আসুক বিপদ, অদৃশ্য হোক সাঁকো—আমি এগিয়ে যাবই!

কিন্তু দরকার একজন গাইডের। সে গুড়েও বালি পড়েছে দেখলাম। তেরোটি অভিযান নেপালের সব ক'জন অভিজ্ঞ শেরপাকে নিয়ে গেছে। শেরপাদের আদি বাসভূমি তিব্বতে। কিন্তু এখন আস্তানা নিয়েছে নেপালে আর মূলত হিমালয়ের পাহাড় কন্দরে। সংখ্যায় তারা পঁচাশি হাজার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এভারেস্ট অভিযানে অংশ নিয়ে খ্যাতির শিখরে উঠে গিয়েছে এরা। হিমালয়ের পাহাড়দের এরা যতটা চেনে ততটা আর কেউ চেনে না। পর্বতারোহনের পক্ষে এদের দেহ যতটা উপযোগী,আর কারো দেহ ততটা উপযোগী নয়। যে উচ্চতায় বাতাসের অভাবে অন্য পর্বতারোহীর ফুসফুস ফেটে যাবে,এরা সেই উচ্চতায় নিশ্বাস নেয় অক্লেশে! তাই ঠাট্টা করে শেরপাদের বলা হয় 'তৃতীয় ফুসফুস'। দুটো ফুসফুস ছাড়াও বাড়তি একটা ফুসফুস চাও তো সঙ্গে নাও শেরপা। কাঠমাণ্ডু তন্ন তন্ন করে চুঁড়েও যখন নির্ভরযোগ্য কোন শেরপা জোটাতে পারলাম না, তখন সুখবর নিয়ে এল পি-কে।

বললে, স্যার! হিলারীর সঙ্গে এভারেস্টে উঠেছে এমন একজনের খবর পাওয়া গেছে।

পাঠকপাঠিকাদের নিশ্চয় মনে করিয়ে দিতে হবে না কে এই হিলারী। ১৯৫৩ সালে সর্বপ্রথম দুই ডানপিটে এভারেস্টের দর্প চূর্ণ করেন। একজন তেনজিং নোরগে, অপরজন স্যার এডমণ্ড হিলারী।

পি-কে নিয়ে এল তাকে। নাম শিমা তেনজিং শেরপা। বয়স আটাশ। খর্বকায়, কিন্তু সব শেরপার মতই বলিষ্ঠ। পর্বতারোহনের কোন প্রমাণ সে দাখিল করতে পারল না। পি-কে'র সুপারিশই

বিশ্বাস করলাম।

কিন্তু প্রথম অসুবিধে দেখা দিল কথা বলতে গিয়ে। শিমা তেনজিং শেরপা মাথা হেঁট করে তাকিয়ে রইল মাটির দিকে। বেচারা ইংরিজি জানে না বললেই চলে, হিন্দিতেও মা গঙ্গা।

শিমা ছাড়া আর শেরপা তো নেই। তাই তাকেই সঙ্গে নিলাম পনেরো টাকা রোজে, খোরাকি ফ্রী। ঝটপট কিনে আনলাম একটা ইংরিজি-নেপালী ডিক্সনারী, আর একখানা ব্যাকরণ যাতে শব্দের উচ্চারণ বিধি দেওয়া আছে। একটা মিনিটও নষ্ট না করে বাছাই করা কয়েকটা শব্দ অধ্যয়ন করতে শুরু করে দিলাম। যেমন, আপাত্তি মানে ডেঞ্জার, উরলান্নু মানে পর্বতারোহন। ইত্যাদি। পাহাড়ে চড়বার সময়ে পরস্পরের ওপর নির্ভর করা পার্টনাররা—কথা বুঝতে না পারলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে যে। তাই আদাজল খেয়ে লেগে গেলাম ডিক্সনারী নিয়ে।

মোটবাহকও জোগাড় হয়ে গেল একজন। নাম তার খুরকেমবা। বয়স চব্বিশ। ওজন ছাপ্পান্ন কিলোগ্রাম। বেশ মজবুত গড়ন। ইংরেজি আর হিন্দিতে সেও মা গঙ্গা। কিন্তু হাসিটি বড় মিষ্টি। সঙ্গী হিসেবে মন্দ হবে না। দশ টাকা রোজে বহাল করলাম তাকে। খাওয়া খরচ তার—এইটাই রীতি। কুলীরা নিজেরা খাবার জুটিয়ে নেয়।

এরপর ঝামেলা হল পারমিট জোগাড় করা নিয়ে। পর্বতারোহন (ক্লাইম্বিং) আর ট্রেকিংয়ের জন্যে আলাদা আলাদা। পারমিট নেওয়া দরকার। ট্রেকিং মানে যে পথে হরবকত যাতায়াত চলে, সেই পথেই যেতে হবে—কয়েকটা পাহাড়ে ওঠা চলবে না। সেসব পাহাড়ের লিস্ট আলাদা। ক্লাইম্বিং পারমিটের নিয়মকানুন কঠোর। দক্ষিণাও বেশি। ট্রেকিং পারমিটের দক্ষিণা মোট কুড়ি টাকা।

খোঁজ নিলাম ট্রেকিং পারমিট নিয়ে কারা গেছে আমার আগে। অযথা কৌতূহল নয়। হিমালয় অভিযাত্রীরা পরস্পরকে জানতে

চায়—জানাতেও হয় সরকার থেকে। তাই যাদের নাম দিল ওরা, তাদের মধ্যেই পেয়ে গেলাম বিশেষ সেই অস্ট্রেলিয়ান সাহেবটির নাম—যার চোখ নীল, বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, কিন্তু অদম্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তাই বুঝি মিষ্টি হাসি লেগেই থাকে মাঞ্জিত চোখে-মুখে।

ট্রেকিং পারমিটই নিলাম আমি। সেই সঙ্গে নিলাম ছ' সপ্তাহের ভিসা—এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে পৌঁছে ফিরে আসার জন্যে হাতে রইল আরও কয়েকটা বাড়তি দিন।

খাবার দাবারের এলাহি ব্যাপার করলে তো চলবে না। তাই যেসব খাবার না নিলেই নয় সেইগুলোই নিলাম। চাল, আলু, ডাল, এক থলি ক্যারামেল টফি, কফি, চা, চিনি, বিস্কুট, বাদাম তেল আর পাঁচ কিলো চীজ। দরকার মত খাবার রাস্তায় কিনে নেওয়া যাবে'খন। হিমালয়ের পথে পথে ট্র্যাভেলার্স চেক ভাঙানো যায় না বলে পাঁচ হাজার টাকা ছোট নোটের বাণ্ডিলে ঠেসে নিলাম আমার জিনিসপত্রের একদম ভেতরে।

মার্চ মাসের দশ তারিখে বাসে চেপে শেরপাদের নিয়ে নাচতে নাচতে আর ঝাঁকুনি খেতে খেতে পৌঁছোলাম দূরের লামোসাঙ্গুতে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে এভারেস্ট যাবার পথ। কিলোমিটারের পর কিলোমিটার বিস্তৃত ঢেউ খেলানো পর্বত সানুদেশ। তার ওপারে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণী যার পঁচিশটা শিখরের উচ্চতা ৭,৬০০ মিটারেরও বেশি। ট্রেকিংয়ের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা না নিয়ে পা বাড়ালাম দুর্গম এই অভিযানে—লক্ষ্য আমার ট্রেকিং নয়—নীলচক্ষু সেই অস্ট্রেলিয়ানের নাগাল ধরা।

পাঠকপাঠিকারা এতক্ষণে নিশ্চয় আমার উদ্দেশ্য অনুধাবন করে ফেলেছেন। তাই আর লুকোচুরি খেলা না খেলে এত জায়গা থাকতে নেপালে কেন এলাম, তা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাক।

স্মরণ থাকতে পারে সুরমা টেলিফোনে আমাকে পিসিমার হত্যা

সংবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেগে উধাও হয়ে গেছিলেন কর্নেল ম্যাসকট। তারপর থেকে তাঁর টিকি আর দেখা যায় নি। নিপাত্তা হয়ে গেছিলেন পুরী থেকে। কি যেন বলতে এসেছিলেন উনি আমাকে। এমন গোপন কথা যা সুরমাকেও বলা যায় না। আমাকে দিয়ে কথা আদায় করেছিলেন—যা শুনব, তা সুরমাকেও বলব না। তারপরেই এল সুরমারই টেলিফোন। কার টেলিফোন এবং কি বার্তা এল টেলিফোনে—তা তাঁর জানার কথা নয়। তবুও ভদ্রলোক শশকের মত বেগে নিষ্ক্রান্ত হলেন ঘর থেকে এবং অদৃশ্য হয়ে গেলেন অশরীরীর মত।

অনেকগুলো রহস্যের আবরণে নিজেকে ঘিরে নিয়ে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। পুলিশ কিন্তু তাঁকে নিয়ে মাথা ঘামায় নি—তাঁর অস্তিত্বও পুলিশ জানত না। মালিনীকে নিয়েই তারা ব্যস্ত ছিল—গোবিন্দর শ্বশুরকে নিয়ে নয়।

আমার মনে তিনি কিন্তু খোঁকা রেখে গেলেন। রহস্যের জট ছাড়ানোর জন্যে অস্থিরতা অনুভব করলাম। এমনকি মালিনীর শোচনীয় পরিণতির পরেও কিছুতেও ভুলতে পারলাম না কি যেন বলতে এলেছিলেন কর্নেল এবং সুরমার টেলিফোন আসতেই চম্পট দিয়েছিলেন।

চম্পট কেন দিয়েছিলেন, তা আমি আঁচ করেছিলাম।

অনুমানটা যাচাই করতেও চেয়েছিলাম।

তাই খুঁজেছিলাম কর্নেলকে।

গোবিন্দর কাছ থেকে তাঁর পুরীর আস্তানার ঠিকানা সংগ্রহ করে একা গেছিলাম। তার আগেই অবশ্য সুরমা আর গোবিন্দ যেখানে কর্নেল যে নেই, খবরটা তারাই দিয়েছে। জিনিসপত্র নিয়ে রাতারাতি তিনি উধাও হয়ে গিয়েছেন।

চাবিটা গোবিন্দর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। ওরা গিয়ে দেখেছিল, বাড়ির দরজা-জানলা সব খোলা—কেউ নেই। নিজেদের

তালা লাগিয়ে এসেছিল দরজায়। আমি গিয়ে খুললাম সেই তালা।

বাড়িটা একতলা। হিপিদের নিবিড় আস্তানা যেদিকে সেই দিকেই নির্জন, নিস্তব্ধ অঞ্চল। সামনে ছোট্ট সিমেন্টের দাওয়া। ছাদে ওঠার সিঁড়ি আছে। ছাদ থেকে সমুদ্র দেখা যায়। ঘর বা দাওয়া থেকে নয়।

একটি মাত্র ঘর একতলায়। এ ছাড়া ঘেরা অঞ্চলে কল-পায়খানা আর রান্নাঘর। রান্নার তৈজসপত্র সেখানে আছে, শোবার ঘরে আছে একটিমাত্র তক্তপোষ, একটা ইজিচেয়ার, একটি পালিশ চটা টেবিল আর চেয়ার। টেবিলে আধপোড়া মোমবাতি। আর কিছু নেই। সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে এসেছেন কর্নেল। মায়ামুক্ত সন্ন্যাসীর মতই নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন বিনা নোটিশে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম পরিত্যক্ত ঘরখানার মধ্যে। এই সেদিনও প্রৌঢ় ওই তক্তপোষে শুয়েছেন। ইজিচেয়ারে গা এলিয়েছেন, হাফপ্যাণ্ট পরে খালি গায়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে সকাল সন্ধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেছেন, তারপর অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

ঘরের পেছনে খোলা জায়গায় স্তূপাকার বালির মধ্যে হাবিজাবি অনেক বাজে জিনিস পড়েছিল। এককালে হয়তো হিপিদের আড্ডা ছিল। তাই মদের বোতল ভাঙা থেকে শুরু করে ভাঙা কালো কাচের চশমা পর্যন্ত সব দেখলাম সেখানে। অসীম যত্নে এই জিনিসগুলোই নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলাম যদি কিছু পাওয়া যায় এই আশায়।

এবং পেলামও।

একদলা কাগজ।

শিশিরে ভেজা বালিতে নোংরা কাগজ।

মেলে ধরেছিলাম দলা পাকানো কাগজখানা। একখানা চিঠি সবে শুরু করে দু'তিন লাইন লিখেই দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে

দেওয়া হয়েছে। সামনেই ঘরের জানলা। জানলার পাশেই টেবিল। ওই টেবিলে বসে মোমবাতি জ্বালিয়ে চিঠি লেখা শুরু করেছিল পত্রলেখক—তা চিত্তে ধরে নি, তাই দলা পাকিয়ে জানলা দিয়ে নিক্ষেপ করে লিখেছে নতুন করে।

আসল চিঠির মূল সুরটা কিন্তু বাতিল চিঠির খসড়ার প্রথম পংক্তিতেই ধরা পড়েছে।

চিঠিখানা এই :

সুরমা,

আই থিংক আই শুড লিভ ইণ্ডিয়া। নেপাল ইজ দ্য বেস্ট প্লেস হোয়্যার আই ক্যান হাইড অ্যাণ্ড গেট পীস। আই মে রেসপণ্ড টু দ্য কল অভ হিমালয় অ্যাণ্ড—

খসড়ার শেষ এইখানেই। কে চিঠি লিখছে, তা লেখা নেই। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম। পাঠকপাঠিকারাও বুঝবেন। যে কেউ বুঝবে। এ বাড়িতে বসে সুরমাকে চিঠি লিখতে পারেন একজনই। তিনি ইণ্ডিয়া ত্যাগ করতে মনস্থ করেছেন। নেপালেই আত্মগোপন করে থাকতে চান শান্তির সন্ধানে। হিমালয়ের ডাকেও সাড়া দিতে পারেন।

কর্নেল ম্যালকটের সন্ধানে তাই আমি নেপাল রওনা হব ঠিক করেছিলাম সেই মুহূর্তে। কিন্তু কাউকে তা বলি নি। কেন বলব? সুরমাকে শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় তিনি চিঠি লিখে গেছিলেন। সুরমা সে চিঠির কথা তো আমাকে বলে নি? কি ছিল সেই চিঠিতে? গোপনীয় এমন কিছু বৃত্তান্ত যা তার বাসুদাকেও বলা যায় না—এমন কিছু বৃত্তান্ত যার জন্যে কর্নেল ম্যালকটের মত ধনবান সন্ন্যাসীসম ব্যক্তিকেও লুকিয়ে থেকে মনের শান্তির অন্বেষণে ছুটে যেতে হচ্ছে সুদূর নেপালে? হিমালয় অভিযানের অভিপ্রায়ও তাঁর রয়েছে।

তাই দলা পাকানো কাগজখানা সযত্নে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলাম

কলকাতা। নেপাল পরিদর্শনের অভিমত ব্যক্ত করে লক্ষ্য করলাম সুরমার মুখের ওপর প্রতিক্রিয়া। চমকে উঠেছিল সুরমা। আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। রাজী হই নি।

সোজা নেপালেও আসি নি। সুরমাকেও বলিনি প্রথমে কোথায় যাচ্ছি।

গেছিলাম দিল্লীতে। দিল্লীর কোন অঞ্চলে কর্নেল ম্যালকটের সঙ্গে সে কৈশোর কাটিয়েছে, তা ওর মুখেই শুনেছিলাম অনেক আগে। কোন স্কুলে পড়েছে, তাও বলেছিল আমাকে। তাই খোঁজ নিতে কোন অসুবিধে হয় নি। বাড়ি খুঁজে বার করেছিলাম। একটা বাড়ির দুটো অংশ। বাঁ দিকের অংশে থাকতেন কর্নেল আর সুরমা। ডান দিকের অংশে এক পাঞ্জাবী পরিবার। কর্নেল চলে যাওয়ার পর তাঁর এক গৃহভৃত্য চাকরি নেয় পাঞ্জাবী পরিবারে। নাম তার মকবুল। অল্প বয়স। চটপটে।

মকবুল মুখ খুলেছিল একশো টাকার একখানি নোট হাতে পেয়ে।

অবিশ্বাস্য সেই কাহিনী শুনে থ হয়ে গিয়েছিলাম।

অজস্র রহস্যের আবরণে ঘেরা কর্নেল ম্যালকট কিন্তু আরও দুর্জ্ঞেয় হয়ে গিয়েছিলেন বিজ্ঞানী মনের কাছে। তাঁর নাগাল ধরার সঙ্কল্পটাও দৃঢ়তর হয়েছিল।

নেপালে এসে অল্প আয়াসেই তাই খোঁজ পেয়ে গেলাম কর্নেল ম্যালকটের—রহস্যাবৃত নীলচক্ষু আধা-হিপি অস্ট্রেলিয়ান প্রৌঢ়ের।

আমি নাকি সাহেব, তাই আমাকে নিতে হল সবচেয়ে কম বোঝা। মোট তেইশ কিলো। শিমা নিল তিরিশ কিলো, আর ছত্রিশ কিলো ওজনের তলায় মনে হল যেন চাপা পড়ে যাবে ক্ষুদে খুরকেমবা। অথচ ওই বিপুল ভার পিঠে নিয়েও সে বিন্দুমাত্র ভারাক্রান্ত হয়েছে বলে মনে হল না। আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার। তাপমাত্রা বাইশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আমি লাল টকটকে জাকিন

জ্যাকেট আর লাল হ্যাভারসাকে ঝলমলে। কিন্তু আমার ছুই সঙ্গীর পরনে সুতির শার্ট আর হাফপ্যান্ট।

আকাশ পথে সিধে উড়ে আমাদের যাত্রাপথ মোটে একশো নব্বই কিলোমিটার। কিন্তু এঁকেবেঁকে খাড়াই উৎরাই পেরিয়ে পথের দৈর্ঘ তার দ্বিগুণ। হিমালয় থেকে বহু নদী ভেসে এসেছে দক্ষিণে। সমকোণে এই সব নদীর অববাহিকা পেরোতে গিয়ে বহুবার আঠারোশো মিটারেরও বেশি পথ খাড়াই ভাবে উঠতে হল। প্রথম দিনেই মোটামুটি মালুম হল ট্রেকিং কি জিনিস।

দ্বিতীয় দিনে রুটিন তৈরি হয়ে গেল সারাদিনের। স্ফটিক স্বচ্ছ আকশের নিচে ঘুম ভাঙত ভোর ছটায়। প্রাতঃরাশ সমাধা করতাম চা আর বিস্কুট খেয়ে। তারপর পাইনের জটলা, আধা-নিরক্ষীয় ঝোপঝাড়, বুনো ফুলে ছাওয়া সবুজ মাঠ আর ছোটবড় টিলা পেরিয়ে যেতে হত একটুকু বিশ্রাম না নিয়ে। যেতে যেতে দেখলাম, আধ হেকটর পরিমাণ ছোট ছোট ক্ষেতে ধান, গম, যব, আলু আর ভুট্টার চাষ করছে নেপালীরা।

প্রতিদিন পেরিয়ে এলাম ছুটি কি তিনটি গ্রাম, কাঠ, পাথর অথবা মাটি দিয়ে তৈরি কটেজ—কখনো সাদা চুনকাম করা। জানলা-গুলোতে রঙ বা পালিশের বালাই নেই। মান্ধাতার আমলের কৃষি সরঞ্জাম নিয়ে চাষ আবাদ চালিয়ে যাচ্ছে চাষীরা। কাঠ বা মাটির বাসনপত্র পিঠে নিয়ে পাহাড়ীরা কতবার পাশ দিয়ে চলে গেল। কেউ ভ্রুক্ষেপও করল না, কেউ হাসল না। নেপাল দেশটা মৃদু হাসির দেশ। সেই সঙ্গে আছে হাত জোড় করে নমস্কার জ্ঞাপন।

সকাল দশটা নাগাদ পেট ভরে খাওয়ার জন্যে দাঁড়াতাম। নিকটস্থ চাষীর কাছ থেকে কখনো সংগ্রহ করে আনতাম মুরগী, ভেড়ুর দাঁড় করিয়ে কিনতাম মাছ। খোলা আগুনে সেঁকে নিতাম, অথবা সেদ্ধ করে নিতাম।

শিমা আর খুরকেমরা ছুপুরের রান্না নিয়ে বসলেই আমি

খুলতাম আমার গ্রামার বইখানা। দুপুর নাগাদ খেয়েদেয়ে তরতাজা হয়ে ফের হাঁটতাম—সন্ধ্যের আগে আর দাঁড়াতাম না।

দ্বিতীয় দিন বিকেল যখন গড়িয়ে এসেছে, আঠারোশো মিটার ঢাল বেয়ে নামবার সময়ে একটা খাড়াই দেওয়ালের মত পাহাড় ঘুরে আসতে হল। উত্তরের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলাম না এই বাধার জন্যে। পাহাড় ঘুরে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে দেখলাম সাত হাজার একশো চুয়াল্লিশ মিটার উঁচু গৌরীশঙ্কর-কে। যেন সিংহাসনে আসীন সম্রাট। গায়ে ঝকমক করছে নীল ধূসর এবং শ্বেতশুভ্র রাজবেশ।

দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম অপরূপ সেই দৃশ্য দেখে। এত কাছ থেকে বিশাল পর্বত এই প্রথম দেখলাম। রাজকীয় রূপ। গৌরীশঙ্করের চূড়ায় দুটি মিনারের মত শিখর হাঁ করে যেন আকাশে কামড় বসাতে যাচ্ছে। মুখবিবর দিয়ে বেরিয়ে আসছে মন্থর গতি তুষার-সাদা মেঘ। অনেক উঁচুতে তুলোর মত মেঘপুঞ্জ উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে ভেসে যাচ্ছে চীনের দিকে। সূর্য তখন ডুব দিচ্ছে। উজ্জ্বল কমলা-গোলাপী রঙে ঝলমলে হয়ে উঠল গোটা পর্বতটা—আগুন লেগে গেল যেন তুলোর মত মেঘরাশিতে।

দাঁড়িয়ে রইলাম সম্মোহিতের মত। সম্বিত ভাঙল চারদিকে ঘনায়মান অন্ধকার দেখে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্রুত নেমে চললাম পাহাড় বেয়ে। চোখ ঘোরাতে পারলাম না কিন্তু দেবমূর্তির মত শিখর থেকে, হোঁচট খেলাম বহুবার, তবুও আঠার মত চাহনি নিবদ্ধ রইল শিখর-দেশে। অবশেষে এসে পড়লাম গাছের তলায়। অদৃশ্য হয়ে গেল গৌরীশঙ্কর।

রাত্রে ঠাঁই নিলাম একটা নেপালী পরিবারের কুঁড়ে ঘরে। মায়ের কোলে শিশু যেমন, কুঁড়ে ঘরটিও পাহাড়ের গা থেকে ঝুলছে তেমনি ভাবে। মাত্র তিন টাকার বিনিময়ে পেলাম একটা খাওয়া আর থাকার জায়গা। বেশির ভাগ নেপালী বাড়ির মতই এটিও দ্বিতল।

ওপরে থাকে ফ্যামিলি, নিচে গরু ছাগল, চাষ-আবাদের জিনিসপত্র আর গরু-মোষের শুকনো খাবার। ওপরের একটি মাত্র ঘরের এক কোণে স্লিপিং ব্যাগ খুলে আমি লম্বা হলাম। আর এক কোণে জ্বলতে লাগল ধূমায়িত খোলা ফায়ারপ্লেস। একই ঘরে গোটা ফ্যামিলি খানাপিনা, কিচিরমিচির এবং প্রেম ভালোবাসা চালিয়ে গেল মাঝরাত পর্যন্ত। কোণে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে এল বাচ্চারা। সব মিলিয়ে সে এক বিকট গন্ধ। কিন্তু আমার পা তখন ছিঁড়ে যাচ্ছে ব্যথায়, ক্লান্তিতে অবসাদে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিস্তেজ হয়ে রইল বলেই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটল না। সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই স্লিপিং ব্যাগের পাশে দেখলাম একটা ভাঁজ করা কাগজ পড়ে আছে। আমার কোন কাগজ তো মাথার কাছে রেখে শুই নি। নেপালীরা কুড়িয়ে পেয়ে হয়তো রেখেছে আমার জিনিস মনে করে।

খুললাম ভাঁজ। একটা ম্যাপ। বিশদ বিবরণ দেওয়া ম্যাপ। যে ম্যাপ কাঠমাণ্ডুতে হন্যে হয়েও খুঁজে পাই নি, সেই ম্যাপ। ম্যাপের ওপর লাল কালি দিয়ে দাগানো একটা পথ। এই পথ দিয়েই যেন যাওয়া ঠিক করেছে ম্যাপের মালিক।

ম্যাপের তলায় লেখা একটি নাম :

কর্নেল ম্যালকট।

শিমা আর খুরকেমবাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কর্নেল ম্যালকটের দাগানো ম্যাপ আমার মাথার কাছে এল কিভাবে। অবশ্য আকারে ইঙ্গিতে জানতে চেয়েছিলাম—নেপালী বিদ্যে তখনও তেমন রপ্ত করতে পারি নি। ওরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। পণ্ডশ্রম বুঝে আর কথা বাড়াই নি।

হয়তো নেপালী ফ্যামিলির কেউ কুড়িয়ে পেয়েছে ম্যাপটা। হয়তো কর্নেল ম্যালকট এই গৃহেই রাত কাটিয়েছিলেন। ম্যাপটা ফেলে গেছেন ভুল করে।

তাই কি ?

যাই হোক, ম্যাপটা আমার অনেক সমস্যার সমাধান করে দিল। খুঁজে খুঁজে আর কর্নেল ম্যালকটকে বার করতে হবে না। ঠিকানা তিনিই রেখে গেছেন অজ্ঞাতসারে।

কাজ চালিয়ে নেওয়ার মত নেপালী ভাষা রপ্ত হতে শিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন কোন পাহাড়ে সে উঠেছে। হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে সে জানিয়েছিল—কোন বড় পাহাড়ে নয়। এর বেশি আর জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় নি। আদৌ কোন পাহাড়ে উঠেছে কিনা, সে সন্দেহ দেখা দিয়েছে আমার মনে। ট্রেকিং করতে বেরিয়ে অনভিজ্ঞ শেরপা সঙ্গে রাখার মত বড় বিপদ আর নেই। রাগারাগি করাটা আরও সাংঘাতিক। তাই যা থাকে কপালে বলে চুপ করে রইলাম।

চতুর্থ দিন বিকেলের দিকে যখন দু' কাঁধের যন্ত্রণায় কাহিল, ফোস্কা বোঝাই পা দুটোকে মনে হচ্ছে সেদ্ধ আলুর মত তলতলে, ঠিক তখনি একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে একগাল হেসে বললে একজন শেরপা, সাহেব কি হাঁপিয়ে গেছেন ?

পরিষ্কার ইংরেজি। কথা বলতে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। লোকটার নাম দোরজী। একটি ইউরোপীয় দম্পতিকে নিয়ে যাচ্ছে এভারেস্টের কাছে সুবিখ্যাত ব্যায়াঙবোচি মঠে। আমার অবস্থা দেখে এসেছে সাহায্য করতে।

সাহায্য নিয়েছিলাম সাগ্রহে। কর্নেল ম্যালকটকে সে দেখেছে। ম্যাপে দাগানো পথেই তিনি এগোচ্ছেন। দ্রুত পা চালালে আমি নাগাল ধরে ফেলব।

দ্রুত পা চালাবো ? আমি তখন ক্ষতবিক্ষত পা দুখানা আর ব্যথা-টনটনে কাঁধ নিয়ে ভাবছি হিলারী প্রতিষ্ঠিত হিমালয়ের বেশ কয়েকটা হসপিট্যালের একটায় আশ্রয় নেব কিনা।

দূরে পৃথিবীর ছাদ তিব্বতের শিখরগুলো কিন্তু আমার মনের মধ্যে নতুন শক্তি এনে দিয়েছিল সেই মুহূর্তে। বিশ্রাম একবারই নেব—যেদিন কর্নেল ম্যালকটের নাগাল ধরব।

এবং ছিন্নভিন্ন করে ফেলব রহস্যের মায়াজাল।

এই দোরজীই আমাকে প্রায় ধরে ধরে নিয়ে এল জানাবসি গ্রামে। একপাল নেপালী বাচ্চা ছেঁকে ধরল আমাকে। 'হামি চকোলেট লিনচৌন—হামি চকোলেট লিনচৌন'। ক্যারামেল টফি কিছু বিলিয়ে নিস্তার পেলাম তাদের হাত থেকে। রাত্রে আবার অস্থির করে তুলল আমার চুল আর জামা টেনে। আর একপ্রস্থ টফি বিলিয়ে তবে রেহাই পাওয়া গেল।

একুশে মার্চ দারুণ ঠাণ্ডা পড়ল। জল জমে বরফ হয়ে যাওয়ার মত ঠাণ্ডা। কলকাতায় তখন কিন্তু রাস্তায় পিচ গলছে। দুধকোশী উপত্যকা দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম অভ্রের কুচো লেগে রয়েছে বড় বড় পাথরের গায়ে। চারদিকে কেবল পর্বতশিখর—হিমালয়ের একদম ভেতরে পৌঁছে গেছি, তারই প্রমাণ। তারপর উপত্যকা পেরিয়ে ঢুকলাম নামচিবাজারে।

উনিশশো একান্ন সাল পর্যন্ত নামচিবাজারে আধুনিক সভ্যতার ছায়াপাত ঘটে নি। ওই বছরেই নেপাল সরকার পরিবর্তন হয় এবং বিশ্বের সব মানুষের কাছে নেপালের দুয়ার খুলে ধরা হয়। নামচি-বাজার এখন তাই কেবল শেরপাল্যাণ্ডের অলিখিত রাজধানীই নয়—পর্বতারোহীদের রসদ সংগ্রহের মূল কেন্দ্র। যদিও নামচিবাজার এখনও সামান্য একটা গ্রাম। খোলামেলা কয়েকটা দোকানে খাবার বিক্রি হচ্ছে, স্রোতস্বিনীর পাশে চৌকোণামন্দিরে ভক্তবৃন্দ আনাগোনা করছে, ছোট্ট বাজারে ইয়াক উল থেকে কার্পেট তৈরি হচ্ছে।

ক্লাইম্বিং অথবা ট্রেকিং—উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, সবাইকে পারমিট চেক করাতে স্থানীয় পুলিশ পোস্টে যেতে হয়। আমিও

গেলাম। পুলিশ অফিসার আমার পারমিট দেখল। দেখেই গম্ভীর মুখে বললে, নামচিবাজার ছেড়ে আমার যাওয়া চলবে না।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কেন—কি অপরাধ আমার? অফিসার অল্প কথায় যা বললে, তার সারমর্ম এই: আমি নাকি ট্রেকিং পারমিটের শর্ত লঙ্ঘন করেছি—ক্লাইম্বিংয়ের চেষ্টা করেছি। কাজেই নামচিবাজারেই আমাকে এখন নজরবন্দী থাকতে হবে। রোজ পুলিশ পোস্টে হাজিরা দিয়ে যেতে হবে—হেড অফিস থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত।

কি কষ্টে যে মাথা ঠাণ্ডা রাখতাম, তা আমিই জানি। কর্নেল ম্যালকট এই নামচিবাজার হয়ে আরও এগিয়ে গেছেন—আর আমি আটক থাকব তাঁর এত কাছে এসে? অনেক বোঝালাম, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। শিমা শেরপাকে দিয়েও কোন কাজ হল না। আমার কথা বুঝলে তো বোঝাব? দোরজীকে খুঁজলাম, কিন্তু তার টিকি দেখা গেল না।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে উঠলাম একটা নেপালী ফ্যামিলির দ্বিতল গৃহে। এ বাড়িটা অনেক পরিষ্কার। সাদা চুনকাম করা। কল-পায়খানা আলাদা। ঘরে দুর্গন্ধ নেই। গেস্টরুম সম্পূর্ণ পৃথক। জানলায় দাঁড়ালে দূরে দেখা যায় উঁচু উঁচু পর্বত—এভারেস্ট, লোৎসে আর নুপৎসে। গম্ভীর মহান সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে কেন জানি না চোখ জ্বালা করে উঠল আমার।

দুদিন অস্থির হয়ে কাটালাম এই ঘরে। তৃতীয় দিন বিকেল গড়িয়ে যখন সন্ধ্যা হতে চলেছে, পুলিশ পোস্ট থেকে ফিরে এসে ঘরে ঢুকেই থ হয়ে গেলাম।

ক্যাম্পখাটে বসে রয়েছেন কর্নেল ম্যালকট।

কর্নেল ম্যালকট!

অন্যমনস্ক হয়ে জানলা দিয়ে এভারেস্ট দেখছিলেন উনি। আমি

ঘরে ঢুকতেই আমার দিকে মুখ ফেরালেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাব পাল্টে গেল। প্রথমে চমকে উঠলেন, তারপর অবাক হলেন, তারপর যেন শঙ্কিত হলেন। পর মুহূর্তেই জোর করে মুখে মিষ্টি হাসি টেনে এনে বললেন, ডক্টর যে!

আমার মুখে কিছুক্ষণ কোন কথা জোগালো না। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম।

কর্নেল সহজ স্বরে বললেন, আপনি কি এ ঘর ভাড়া নিয়েছেন?

ঘাড় নেড়ে নীরবে সায় দিলাম।

কর্নেল বললেন, দোরজী কিন্তু আপনার নাম বলল না তো!

দোরজী!—এতক্ষণে কণ্ঠস্বর ফুটল আমার।

হ্যাঁ। জিনিসপত্র সব চুরি হয়ে গেল কিনা। ট্রেকিং ইনকমপ্লিট রেখে প্রাণ বাঁচাতে ফিরে এলাম। দোরজী শেরপাই বাজার থেকে ধরে নিয়ে এল আমাকে। বললে একখানাই ঘর আছে এখন—এক সাহেবের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিন। আমি কি জানতাম আপনিই সেই সাহেব?

জানলে কি করতেন?—দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম আমি।

কি করতাম?—আনমনে বলে ফের জানলা দিয়ে ঘনায়মান সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে রইলেন কর্নেল। ঘরের মধ্যেও একটু একটু করে আঁধার জমা হচ্ছে তখন। উনি বললেন, মোমবাতি আছে তো?

নিরুত্তরে দেশলাই জেলে মোমবাতি ধরিয়ে দিলাম। চোখ রইল কিন্তু কর্নেলের ওপর। দরজার কাছ থেকে খুব দূরে গেলাম না।

বিষণ্ণ মুখে আমাকে দেখছিলেন কর্নেল। বললেন, আপনি কি ট্রেকিং করতে এসেছেন?

না। আপনাকে ধরতে।

আমাকে ধরতে? কেন?

আমা'র মুখে শুনতে চান ?

চুপ করে রইলেন কর্নেল। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আমিও বলতে পারি। বলবার জন্যেই তো সেদিন গেছিলাম আপনার কাছে।

মোমবাতির ম্লান আলোয় কর্নেলের শীর্ণ মুখের একদিকই দেখতে পেলাম। সেদিকে কেবলই বিপদ। আর কিছু নয়।

বললাম, যখন বলতে যাচ্ছেন, ঠিক তখনই একটা টেলিফোন এল, আপনিও ছুটে পালিয়ে গেলেন। কেন পালিয়ে গেলেন, আমি তা জানি।

আপনি জানেন ?

হ্যাঁ, জানি। লো-টেবিলের ওপর একটা ফোটোগ্রাফ রেখে আমি ফোন ধরতে উঠে গেছিলাম। আপনি সেই ফটো দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠে পালিয়ে গেছিলেন। ভেবেছিলেন আমার সঙ্গে ফটোর মেয়েটির এতই যখন আঁতাত, তখন তো আপনার গোপন কাহিনী আমাকে আর বলা যায় না। কেন যায় না ? এই মেয়েটিই তো আপনাকে ব্ল্যাকমেলিং করে এসেছে বছরের পর বছর। আপনার গোপন কাহিনী একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ তা জানে না। এই মেয়েকেই সমুদ্র সৈকতে যেদিন থেকে বসে থাকতে দেখেছেন, আপনি সমুদ্রের ধারে আসা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভয়ে—তাই না কর্নেল ?

কর্নেল চমকে উঠলেন।

আমার আর কোন সন্দেহই রইল না। কণ্ঠস্বর আরো তীক্ষ্ণ করে বললাম, কিন্তু আপনি মস্ত ভুল করেছিলেন কর্নেল। যার ছবি আপনি দেখেছিলেন, সে মোহিনী নয়, ব্ল্যাকমেলার নয়—তারই যমজ বোন মালিনী।

মালিনী !

হ্যাঁ, মালিনী। মোহিনীর ঠিক উল্টো চরিত্রের মেয়ে। চেহারা

এক থাকায় মোহিনী তার সুখের সংসার বারবার ভেঙে দিয়েছে। এবারেও ভেঙে দিয়ে গেল। মোহিনী যেমন আর বেঁচে নেই, মালিনীও তেমনি আর ইহলোকে নেই। মোহিনী খুন হয়েছে আর মালিনী আত্মহত্যা করেছে—না করলে পুলিশ তাকে ছাড়তো না।

ধীরে ধীরে ক্যাম্পখাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল : আত্মহত্যা করেছে?

বসুন।—বললাম আমি, সে মরে বেঁচেছে। কিন্তু তার নামের ওপর যে মিথ্যে অপরাধের বোঝা আপনি চাপিয়ে দিয়ে গেছেন, তা নামিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। না, না, বসুন আপনি। এ ঘর থেকে বেরোবার চেষ্টাও করবেন না। কর্নেল, আমি জানি, মোহিনীকে আপনিই গুলি করে খুন করেছিলেন।

আস্তে আস্তে ক্যাম্পখাটে বসে পড়লেন কর্নেল ম্যালকট। মুখ তাঁর আশ্চর্য রকমের শান্ত।

আমার গলা কিন্তু উত্তেজনায় কাঁপছে—স্বর ভেঙে গেছে। ভাঙা গলায় বললাম, মালিনী যদি রিভলবার চালিয়ে গুলিই করতো, রিভলবার ঘরেই রেখে যেত। পায়ের চটি পর্যন্ত যে ফেলে রেখে জলে গিয়ে ডুবে মরেছে, সে কি রিভলবার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে? কর্নেল, আমি জানি সে রিভলবার খুঁজলে আপনার ব্যাগেই পাওয়া যাবে এখন। রিভলবারটা আমাকে দিন, পুলিশকে দেবো। ফরেনসিক রিপোর্ট পেলেই প্রমাণিত হয়ে যাবে খুনী কে, প্রমাণিত হয়ে যাবে মালিনী নির্দোষ।

কর্নেল যেন পাথর হয়ে গেছেন।

কিন্তু আমার মাথায় তখন দেহের সমস্ত রক্ত যেন ঠেলে উঠেছে। মাথা যেন ফেটে পড়তে চাইছে। ভাঙা গলায় তীব্রতর কণ্ঠে বললাম, দিল্লী গিয়ে খোঁজ নিয়ে আমি সব জেনেছি কর্নেল। মনের ডাক্তারের কাছে পাপের যে কাহিনী ব্যক্ত করে সুস্থ হতে গেছিলেন,

তা আর আমার অজানা নয়। এত বড় মহাপাপ আপনি করলেন কি করে কর্নেল ? বন্ধুর তেরো বছরের মেয়েকে আশ্রয় দিয়ে আপনি তাকে ভোগ করে গেছেন রাতের পর রাত। কৃষ্ণাঙ্গিনীদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের আকর্ষণ নতুন কিছু নয়। কিন্তু সে যে আপনার বন্ধুকন্যা—বাড়ন্ত গড়নের বলেই কি—

ডাক্তার !—ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন কর্নেল, এই কথাটাই খুলে বলতে গিয়েছিলাম আমি। আমি অসুস্থ কি সুরমা অসুস্থ, তা আপনাকে দিয়ে বিচার করতে গিয়েছিলাম। আমাকে উদ্দীপ্ত করে টেনে নামিয়েছে সুরমাই। আমার অপরাধ আমি নিজেকে সামলাতে পারি নি। কতবার সামলে নিতে গেছি নিজেকে, কিন্তু সুরমা··· সুরমাই···তাই ওর বিয়ের ব্যবস্থা হতে খুশিই হয়েছিলাম। অথচ বিয়ের পরেও যখন দেখলাম যুবক স্বামী নিয়ে সে সুখী নয়, তখন—

আমি বললাম, আমি তা লক্ষ্য করেছি কর্নেল। সুরমার কথার মধ্যেই ওর মনোগত অভিপ্রায় ফুটে উঠেছে। ওর আকর্ষণ বয়োবৃদ্ধদের দিকে—প্রায় সমবয়সীদের দিকে নয়। দাম্পত্য জীবনে তাই ওরা যে পুরোপুরি সুখী নয়, তা আঁচ করেছিলাম। তারপর যখন মালিনীর ফটো দেখে পালিয়ে গেলেন—রহস্যটা কোথায়, তা একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু এত নোংরামী কল্পনাও করতে পারি নি। আপনাকে আর সুরমাকে ব্ল্যাকমেল করছিল মোহিনী। তাই সুরমাও মালিনীর ছবি দেখে মোহিনী ভেবে চমকে উঠেছে—মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তাই যখন মোহিনী গোবিন্দর পিসিমাকেও ব্ল্যাকমেল করবে বলে ঠিক করেছিল, তখন পিসিমা গোবিন্দ আর সুরমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল বাড়িতে সত্যি মিথ্যে যাচাই করার জন্যে। আপনারা এই নিয়েই যখন কথা বলছিলেন, আমি গিয়ে পড়েছিলাম মাঝখানে। আর কথা বলতে পারেন নি। ঠিক কিনা ?

হ্যাঁ, ঠিক।

কর্নেল ম্যালকট, মোহিনীকে খুন করে মালিনীকে আত্মহত্যার পথে শুধু আপনিই ঠেলে দেন নি, দিয়েছে সুরমাও। সেই রাতে পিসিমা চেঁচিয়েছিলেন 'তুই ডাইনী, তুই কুলটা, তুই বেশ্যা' বলে। সত্যিই উনি হয়তো ওই বলেই চেঁচিয়েছিলেন—সত্যি কি মিথ্যে তা বলতে পারে সুরমা। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পিসিমা গালাগাল দিচ্ছিলেন সুরমাকেই—তার ভ্রষ্টা চরিত্রের পরিচয় পেয়ে। সুরমা আর মাথার ঠিক রাখতে পারে নি, পুরুষের মতই শক্তিমতী সে! তাই গলা টিপে পিসিমাকে শেষ করে দিতে সময় লাগে নি বেশি। মালিনীর ছবি সে দেখে গেছিল আমার কাছে। তাকে মোহিনী মনে করে খুনীর অপবাদে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর চমৎকার প্ল্যানটা সে বানিয়েছিল ওইটুকু সময়ের মধ্যে। কিন্তু এমনই কপাল তার, ঠিক সেই সময়ে পুলিশের লোকের সঙ্গেই ছিল মালিনী। নইলে তাকে আরো একটা মিথ্যে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত হতে হতো। সুরমার টেলিফোন পেয়ে আমি খুন শব্দটা উচ্চারণ করতেই আপনি বুঝেছিলেন জল অনেকদূর গড়িয়েছে। মোহিনী যে পুরীতে এসেছে, সে খবরও আপনি রাখতেন। তাই সেই রাতেই তার পিছু নিয়েছিলেন—মালিনীর বাড়িতে তাকে গুলি করে খুন করে পালিয়ে আসেন নেপালে। আসবার আগে একটা চিঠি লেখেন সুরমাকে। প্রথম তিন লাইন লিখে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন। সেই ফেলে দেওয়া কাগজটা পড়েই আপনার ঠিকানা পাই। এই সেই কাগজ। —বলে পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে টেনে নিলাম ভাঁজ করা কাগজটা: কর্নেল, সুরমাকে আমি প্রোটেক্ট করেছি এবং করব। কেননা পিসিমার মার্ডারের জন্যে মালিনীকে দায়ী করা হয় নি। কিন্তু আপনার অপরাধে অপরাধী হয়ে শাস্তি পাচ্ছে না মালিনীর আত্মা। আপনাকে একটা স্টেটমেন্ট লিখে দিতে হবে—এইখানে, এখুনি। মোহিনীকে আপনি খুন করেছেন—মালিনীকে নয়। আপনার রিভলবারটাও আমাকে দেবেন—এখুনি।

হঠাৎ মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল কর্নেলের। এতক্ষণ যিনি শান্ত হয়ে শুনছিলেন আমার ভগ্ন স্বরের নায়েগ্রা-সম ধারাবিবরণী, সহসা তিনি কেন নিরক্ত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছনে তাকালেন দেখবার জন্যে আমি পেছন ফিরলাম।

দেখলাম, আমার ঠিক পেছনেই ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে সুরমা। পিস্তল নির্ঘোষটা শুনলাম সঙ্গে সঙ্গে। ঝটিতে ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখলাম মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছেন কর্নেল ম্যালকট। হাত থেকে ঠিকরে যাচ্ছে ধূমায়িত রিভলবার।

পিঠের ওপর একটা দেহ এলিয়ে পড়তেই পেছন ফিরে তাকে ধরে ফেললাম। অজ্ঞান হয়ে গেছে সুরমা। মেঝেতে শুইয়ে দিতে দিতেই দুমদাম করে সিঁড়ি বেয়ে লাফাতে লাফাতে উঠে এল শিমা শেরপা। হাঁপাতে হাঁপাতে বেগে ঘরে ঢুকেই বললে পরিষ্কার ইংরেজিতে: ইস্, গুলি চলবে ভাবতে পারি নি তো?

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম: শিমা তুমি ইংরেজি জানো?

অবাক হয়ে শিমা বললে, জানবো না কেন?

তবে কেন অ্যাদ্দিন ইংরেজি বলো নি?

ওপরতলার অর্ডার ছিল। আপনাকে আগলে রাখার জন্যেই আমি এসেছি—ইংরেজি বলতে নয়।

কে তোমার ওপরতলা?

আপনার বন্ধু।

বিপ্লব? বিদ্যুৎ চমকের মত সম্ভাবনাটা ভিড় করে এল মস্তিষ্কে।

হ্যাঁ। উনি জানতেন আপনার ওপর নজর রাখলেই মোহিনীকে যে খুন করেছে, তাকে ধরা যাবে। কেননা, হয় সে আপনার কাছে আসবে অথবা আপনিই তার কাছে যাবেন।

বিপ্লব। বিপ্লবের এত কুচুটে বুদ্ধি? আরও একটা সন্দেহের কালো ছায়া পড়ল মনের মধ্যে—কর্নেল ম্যালকটের নাম লেখা

ম্যাপটা মাথার কাছে কে রেখেছিল ? তুমি ?

মুখ কাঁচুমাচু করে শিমা বললে, ও, ইয়েস। আপনি কর্নেলের পেছন নিয়েছিলেন। তাই আপনাকে ওর নাগাল ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম তাড়াতাড়ি। ম্যাপটা আমার—নাম লিখে দিয়েছিলাম কর্নেলের। পথের ঠিকানা আমি আগেই জানতাম।

রেগে গিয়ে বললাম, কিন্তু এত লুকোচুরি খেলে লাভ হল কিছু ? যার জন্যে বিপ্লব এত কাণ্ড করল, তাকে তো ধরতে পারলে না।

গম্ভীর হয়ে শিমা বললে, আজ্ঞে, তাকেই তো ধরেছি। আমরা ঠিক জানতাম সে আপনার কাছে আসবে।

শিমার কণ্ঠস্বরটা বড় অদ্ভুত। ভুরু কুঁচকে বললাম, কি বলতে চাও ?

সিঁড়ির দিকে চেয়ে শিমা বললে,ওই তো তার পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি।

উঠে এল একাধিক পদশব্দ। মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় প্রথমে উঠে এল বিপ্লব, তার পেছনে দোরজী, সবার পেছনে শুভ্রবসনা একটি নারীমূর্তি।

মালিনী পোদ্দার !

মাথা ঘুরে গেল আমার। টলে পড়ে যেতাম, যদি না শিমা তার সবল বাহু বাড়িয়ে ধরে ফেলত আমায়।

পুলিশ পোস্টে পৌঁছে বিপ্লব বললে, বাস্তু, এই ছলচাতুরীর জন্যে ক্ষমা করিস।

আমি তখন বাক্‌রহিত। বিমূঢ়। মস্তিষ্ক অসাড়। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছি মালিনীর মুখের দিকে। প্রেতিনী নয়—প্রাণবন্ত, গভীর নয়না সেই মালিনী।

বিপ্লব বললে, পুলিশকে দিয়ে পারমিটের ছুতো তুলে তোকে আমিই আটকে রেখেছিলাম এখানে। দোরজী গিয়েছিল কর্নেল

ম্যালকটের জিনিসপত্র লোপাট করতে, যাতে উনি ফিরে আসেন। আমরা নজর রেখেছিলাম কাঠমাণ্ডু এয়ারপোর্টে। জানতাম মালিনী তোর সব খবর রাখে—তোর পেছন পেছন ফাঁদে পা দেবেই। কাঠমাণ্ডু থেকে নামচি পর্যন্ত প্লেনে এসে পাহাড় দেখে সাহেবরা ফিরে যায়। প্লেনে আসার সুযোগটা আছে বলেই নামচিতে তোদের পাকড়াও করব ঠিক করেছিলাম। সত্যিই ফাঁদে পা দিলেন মালিনী পোদ্দার।

অতলান্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল মালিনী—আমি চেয়ে রইলাম ওর দিকে। বিপ্লবের কথাগুলো মনে হল যেন সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার থেকে ভেসে আসছে কানে—রাজকন্যে কিন্তু বসে আমার সামনেই।

বিপ্লব বললে, একই প্লেনে সুরমা আর মালিনী দেবীকে উঠতে দেখে মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। মালিনী দেবীকে অবশ্য সুরমা দেবী চিনতে পারেন নি—উপায়ও ছিল না। উনি বোরখা পরেছিলেন আগাগোড়া। পাছে ধরা পড়ে যান, এই ভয়ে। নামচিতে প্লেন ল্যাণ্ড করতেই ওঁকে আমরা অ্যারেস্ট করি। তার পরেই দোরজী দৌড়োতে দৌড়োতে এসে বললে—এখুনি চলুন, খুনী ধরা পড়েছে। আসতে আসতেই খুনী সটকান দিল রে—কি ভোজ দিলি বল তো?

অবসন্ন কণ্ঠে বললাম, দোরজীও কি তোর লোক?

না। মালিনী দেবীর লোক।

মালিনীর দিকে ফিরতেই মাথা হেঁট করল সে।

বিপ্লব বললে, সত্যিই সতী সাবিত্রী। বড় ভালবাসেন তোকে। সারা জীবন তোকে চোখে চোখে রাখবেন ঠিক করেছিলেন। নেপালেও এসেছিলেন তোর পেছন পেছন, কিন্তু তুই ছুট করে ট্রেকিংয়ে বেরিয়ে পড়ায় দোরজীকে পাঠিয়েছিলেন তোর ওপর নজর রাখার জন্যে।

বিপ্লব।—বললাম আমি, মালিনী যে বেঁচে আছে জানলি কি করে?

অনুমান করে।—হেসে বললে বিপ্লব, পুলিশের লোককে যতটা নিরেট ভাবিস, ততটা নিরেট তারা নয়। মালিনী যে মোহিনীকে খুন করে নি, তা ঘরের মধ্যে রিভলবার নেই দেখেই আঁচ করেছিলাম। রিভলবার হাতে নিয়ে সাড়ম্বরে কেউ জলে নেমে যায় না। রিভলবার নিয়ে গেছে যে, সে-ই যে খুন করেছে মোহিনীকে, আমি সেটা আঁচ করেছিলাম। তুই জানিস সে কে। তাই তোর ওপরেও নজর রেখেছিলাম। মালিনীর নামে মিথ্যে অপবাদ খণ্ডন করার জন্যে তুই যে দরকার হলে পৃথিবীটাকে চক্কর দিবি, তা তোর চরিত্র জানি বলেই পেছনে লোক রেখেছিলাম। প্র্যাকটিশ শিকেয় তুলে রেখে তোর নেপাল যাওয়াটাই তো সন্দেহজনক। পরে দিল্লী গিয়ে কর্নেল সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতেই আমি আঁচ করেছিলাম তোর সন্দেহ কাকে। যাই হোক, পুরীর সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে যখন দেখলাম, মালিনী দেবীর পায়ের ছাপ জলে নেমে গেছে দেখেই তুই ভেঙে পড়েছিস, তখন তোর কাছে যখন ক্ষমা চাইছিলাম, তখনই জানি উনি জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে অন্য কোথাও বালিতে উঠে পড়েছেন। ঠিক কিনা?

হেসে ফেলল মালিনী।